

শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

দাখিল
সপ্তম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ
থেকে দাখিল সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

দাখিল

সপ্তম শ্রেণি

রচনা
আবু মুহাম্মদ
মোঃ আবদুল হক
মোঃ তাজমুল হক
জসিম উদ্দিন আহমদ

সম্পাদনা
প্রফেসর আব্দুল ফারুক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবাল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

তাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিরোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্প্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়টি সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন এই জীবন দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়টি মূলত ব্যবহারিক। তাই হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য তান্ত্রিক ও ব্যবহারিক অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমূল্যী করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষা, পুষ্টি জ্ঞান, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। মাদকাসক্তি ও এইড্স-এর ভয়াবহতা সম্পর্কে জানবে, সচেতন হবে এবং এ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। একইসাথে বিভিন্ন ধরনের শরীরচর্চা ও খেলাধুলার সঠিক নিয়ম-কানুন জেনে একজন সুস্থ ও কর্মক্ষম নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তকবূপে প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

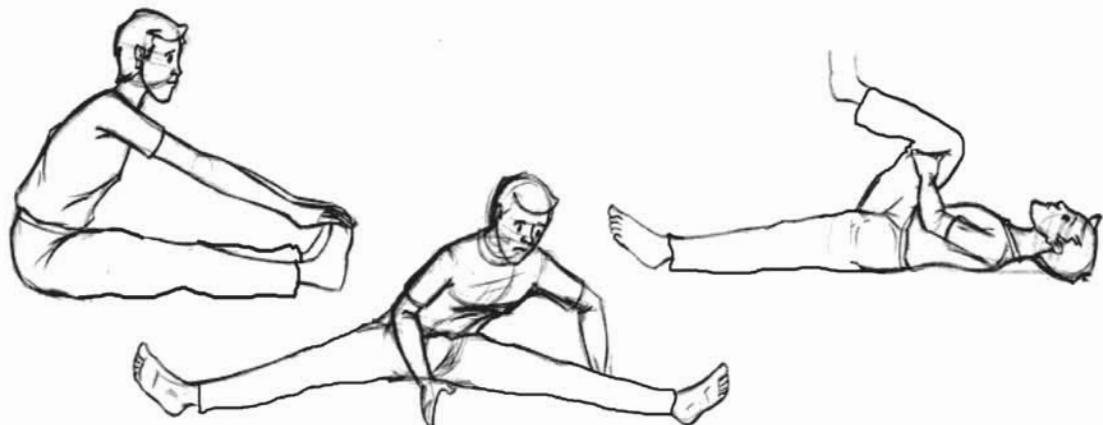
সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	শরীরচর্চা ও সুস্থজীবন	১-১১
দ্বিতীয়	স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং	১২-২৩
তৃতীয়	স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পরিচিতি ও স্বাস্থ্যসেবা	২৪-৩০
চতুর্থ	বয়ঃসন্ধিকালের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা	৩১-৩৭
পঞ্চম	জীবনের জন্য খেলাধূলা	৩৮-৬০

প্রথম অধ্যায়

শরীরচর্চা ও সুস্থিজীবন

মানুষের দেহের সাথে মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে দৈহিক উন্নতির সাথে সাথে ব্যক্তির মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতিও সম্মুক্ত হয়েছে। শারীরিক অঙ্গসংকালন ও খেলাধূলার মাধ্যমে শারীরিক সুস্থিতা অর্জন, চিন্তিনোদন, শৃঙ্খলাবোধ ও নেতৃত্বাদানের ক্ষমতা অর্জন করা যায়। দেহের উন্নতি ও মানসিক বিকাশ সাধন করে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে সুস্থ জীবনযাপনই হলো এর মূল লক্ষ্য।



বিভিন্ন রকম শরীরচর্চা

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

১. ধারাবাহিকভাবে মন্ত্রাসার প্রাত্যহিক সমাবেশের নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব।
২. সুস্থ জীবনের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি বর্ণনা করতে পারব।
৩. শরীর গঠনের জন্য ব্যায়ামের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
৪. অভিযন্ত ব্যায়ামের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
৫. সরঞ্জামবিহীন ও সরঞ্জামসহ ব্যায়ামের নিয়মকানুন বর্ণনা করতে পারব।
৬. প্রাত্যহিক জীবনে সময়ানুবর্তিতা অনুসরণের ব্যাপারে উদ্ব�ৃক্ষ হব।
৭. ব্রহ্মচারী ব্যায়াম অনুশীলন করতে পারব।
৮. নিয়মকানুন মেনে সরঞ্জামসহ ব্যায়াম করতে পারব।

পাঠ-১ : প্রাত্যহিক সমাবেশের নিয়মাবলি

মন্দাসার শিক্ষার্থীরা প্রত্যহ ক্লাস শুরু হওয়ার পূর্বে শৃঙ্খলার সাথে সারিবদ্ধভাবে মন্দাসার সামনের মাঠে বা খোলা জায়গায় উপস্থিত হবে। শিক্ষার্থীরা সমাবেশে হাউজ বা শ্রেণি অনুসারে দাঁড়াবে। প্রধান শিক্ষক, শ্রেণিশিক্ষক, শারীরিক শিক্ষক ও সমাবেশ পরিচালনাকারী শিক্ষার্থীরা যার যার নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াবে। দাঁড়ানোর সময় অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার শিক্ষার্থীরা সামনে দাঁড়াবে, বড়ো ক্রমান্বয়ে পিছনে দাঁড়াবে।

সমাবেশের ধারাবাহিক কার্যক্রম –

১. **জাতীয় পতাকা উত্তোলন :** জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় সকলে ‘সোজা’ বা ‘এ্যাটেনশন’ অবস্থায় থাকবে। কেউ নড়াচড়া করবে না। প্রধান শিক্ষক বা একজন সিনিয়র শিক্ষক পতাকা উত্তোলন করবেন।
২. **জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন :** সমাবেশ পরিচালনাকারী শিক্ষার্থী যখন বলবে- ‘পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করো’, তখন সকলে একসাথে পতাকার উদ্দেশ্যে ডান হাত কপাল বরাবর তুলে অভিবাদন জানাবে। যখন বলবে, ‘হাত নামাও’, তখন একসাথে হাত নামাবে।
৩. **ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ :** একজন শিক্ষার্থী সামনে এসে তার নিজ ধর্মগ্রন্থ থেকে নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করবে। অন্য শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে শুনবে। এ সময় সকল শিক্ষার্থী ‘আরামে দাঁড়ানো’ অবস্থায় থাকবে।
৪. **শপথ গ্রহণ :** শপথ গ্রহণের সময় সকল শিক্ষার্থী ‘সোজা’ অবস্থায় থাকবে। ডান হাত কাঁধ বরাবর তুলবে। হাতের তাপু খোলা, তবে আঙুলগুলো একত্র থাকবে। একজন শিক্ষার্থী সামনে এসে শপথবাক্য পাঠ করবে এবং সকল শিক্ষার্থী সমস্বরে তার সাথে তা পাঠ করবে। শপথ গ্রহণ শেষে ‘হাত নামাও’ বলার সাথে সাথে সকলে একসাথে হাত নামাবে।
৫. **জাতীয় সংগীত :** শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থী সকলে ‘সোজা’ অবস্থায় থাকবে এবং সকলে একসাথে জাতীয় সংগীত গাইবে।
৬. **প্রধান শিক্ষকের ভাষণ :** প্রধান শিক্ষক বা তাঁর অনুপস্থিতিতে কোনো সিনিয়র শিক্ষক ভাষণ দেবেন।
৭. **শরীরচর্চা অনুশীলন :** ভাষণ শেষে শারীরিক শিক্ষক পাঁচ মিনিট সমবেত ব্যায়াম করাবেন। তবে এমন ধরনের সমবেত ব্যায়াম (পি.টি) করানো যাবে না, যাতে শিক্ষার্থীদের জামাকাপড়ে ময়লা লাগে।
৮. **সমাবেশ শেষে শ্রেণিশিক্ষক বা শ্রেণির দলনেতার নেতৃত্বে শিক্ষার্থী সারিবদ্ধভাবে স্ব স্ব ক্লাসে ঢলে যাবে।**

কাজ-১ : সমাবেশের কার্যক্রমগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর।

কাজ-২ : সমাবেশে কে কোথায় দাঁড়াবে তা মাঠে গিয়ে প্রদর্শন কর।

পাঠ-২ : প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধির ধারণা

স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার পালনীয় বিধি-বিধানই হলো স্বাস্থ্যবিধি। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞানগুলো ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং সুস্থান্ত্র অর্জন সম্পর্কে সচেতন করে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ভালো রাখতে যা কিছু করা বা নিয়ম পালনের প্রয়োজন, তা ব্যক্তিকেই করতে হবে। স্বাস্থ্য রক্ষায় যেসব বিধি মেনে চলতে হয়, তা আলোচনা করা হলো –

১. শারীরিক পরিচ্ছন্নতা : রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আমাদের শারীরিকভাবে পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন। দেহ অপরিষ্কার বা অপরিচ্ছন্ন থাকলে রোগ-জীবাণু সহজে দেহে প্রবেশ করে। এ জন্য পরিচ্ছন্ন থাকার নিয়মগুলো পালন করতে হবে। যেমন-

১.১ নিয়মিত গোসল : বিভিন্ন কাজকর্ম ও খেলাধূলা করার সময় গায়ে ময়লা লেগে শরীর অপরিচ্ছন্ন হয়। এতে শরীরে জীবাণু ঢোকে। এ জন্য প্রতিদিনই গোসল করা উচিত। গোসলের সময় সাবান মাখা ভালো। এতে সহজে ময়লা ও ঘামের গুরুত্ব দূর হয়।

১.২ দাঁত ও মুখ পরিষ্কার : সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং আহারের পর দাঁত ও মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। দাঁত না মাজলে দাঁতের ফাঁকে খাদ্যকণা জমে মুখে দুর্গুর্ধ্ব ছড়ায় ও দাঁতের ক্ষতি করে। রাতে শোয়ার আগে দাঁত পরিষ্কার করা উচিত।

১.৩ চুলের যত্ন : শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয় বরং দেহের পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রত্যহ চুলের যত্ন নেয়া প্রয়োজন। গোসলের পর প্রত্যহ চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানো ভালো। এতে চুলের গোড়া শক্ত হয় ও চুলের ভেতর ময়লা জমতে পারে না। সঞ্চাহে কমপক্ষে দুই দিন চুল সাবান/শ্যাম্পু দিয়ে ধোয়া উচিত।

১.৪ নখ কাটা : হাতের নখ একটু বড় হলেই কেটে ফেলা উচিত। নখ বড় হলে তার মধ্যে ময়লা জমে থাকে। আহারের সময় সেই ময়লা খাবারের সাথে পেটে প্রবেশ করে এবং নানা রকম পেটের অসুখ ও কৃমি হয়।

১.৫ হাত পরিষ্কার করা : হাত দিয়ে আমরা সবকিছু ধরি ও নানারকম কাজ করি। এ জন্য হাতে ময়লা লেগে থাকে। হাত পরিষ্কার না করে সেই হাত দিয়ে খাবার খাওয়া ঠিক নয়। খাবার আগে ও পরে প্রতিবারই হাত ভালোভাবে পরিষ্কার করা উচিত।

১.৬ মলমূত্র ত্যাগ : সকালে শ্যায়ত্যাগের পর মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস করা ভালো। মলমূত্র ত্যাগের বেগ কখনো দমন করা উচিত নয়। দৈনিক খাদ্যতালিকায় ফলমূল ও শাকসবজি থাকা ভালো। এতে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না, সহজে মলত্যাগ করা যায়। প্রতিদিন একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের গড়ে ১০/১২ গ্লাস পানি পান করা প্রয়োজন। এতে শরীর থেকে দুষ্পুর পদার্থ ঘাম ও প্রস্তাবের সাথে বের হয়ে যায়।

২. বাসগৃহের পরিচ্ছন্নতা : ঘরে যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস সহজে প্রবেশ করতে পারে, এজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জ্বালালা, দরজা থাকতে হবে। ঘর ও এর আশপাশ সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে। ঘরের মেঝে প্রতিদিন সকাল- বিকেল মুছতে বা ঝাড়ু দিতে হবে। কাঁচা ঘর হলে মাঝে মাঝে লেপতে হবে। পাকা দালান হলে কয়েক বছর পর পর প্রয়োজনীয় সংক্ষার ও রং করা উচিত।

৩. খাদ্য গ্রহণের নিয়ম : খাদ্য গ্রহণে যে সকল নিয়মগুলো পালন করা ভালো –

৩.১ নির্দিষ্ট সময়ে খাবার খেতে হবে।

৩.২ পচা, বাসি খাবার পরিহার করতে হবে। যে খাদ্য সহজে হজম হয়, তেমন খাবার খাওয়া উচিত।

৩.৩ খাবার চিবিয়ে ও ধীরে ধীরে খেতে হবে।

৩.৪ বেশি না খেয়ে পরিমিত খাবার খেতে হবে।

৩.৫ সব ধরনের খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

৩.৬ খাবারে শাকসবজির পরিমাণ বেশি থাকতে হবে।

৪. পোশাক-পরিচ্ছন্দ : দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, শীত ও উত্তাপ থেকে দেহকে রক্ষা করার জন্য সময়োপযোগী পোশাক পরা উচিত। পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রত্যহ ধূয়ে শুকানো ভালো। ঘামযুক্ত বা ২/৩ দিনের ব্যবহার করা কাপড় একনাগাড়ে পরা অস্বাস্থ্যকর।

৫. খেলাধুলা ও ব্যায়াম : শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা উচিত। তবে মনে রাখতে হবে, অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়। সামর্থ্য অনুযায়ী খেলাধুলা ও পরিমিত ব্যায়াম করতে হবে। তাহলে শরীর সুস্থ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ সুদৃঢ় হবে।

৬. বিশ্রাম ও ঘুম : দৈহিক পরিশ্রম ও ব্যায়ামের ফলে দেহের কোষগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত ও নিষ্ঠেজ হতে থাকে। জীবকোষগুলো পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজন। একজন সুস্থ লোকের দৈনিক ৭/৮ ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন। এতে জীবকোষগুলো সতেজ ও মস্তিষ্কের কোষগুলোর ক্ষয়পূরণ হয়।

৭. অভ্যাস : ‘মানুষ অভ্যাসের দাস’। তবে কিছু অভ্যাস আছে যা পরিত্যাগ করতে হবে। একবার অভ্যাস খারাপ হয়ে গেলে তা সংশোধন করতে সময় লাগে। সেজন্য সব সময় খারাপ অভ্যাস যাতে গড়ে না উঠে, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। সুঅভ্যাস গঠনের জন্য যে সকল বিষয়গুলো অনুসরণ করা যেতে পারে-

৭.১ অধিক রাত পর্যন্ত জেগে না থাকা।

৭.২ সূর্য উঠার পরও ঘুমিয়ে না থাকা।

৭.৩ নির্দিষ্ট সময়ে পরিমিত স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া।

৭.৪ যেখানে-সেখানে মলমৃত্ত্য ত্যাগ না করা।

৭.৫ অথবা সময় নষ্ট না করা।

কাজ-১ : শারীরিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য কী কী কাজ করতে হবে তার তালিকা প্রস্তুত কর।

কাজ-২ : ভাল অভ্যাসগুলো কিভাবে তৈরি করবে তার বর্ণনা দাও।

পাঠ-৩ : শারীরিক সুস্থতায় ব্যায়ামের প্রভাব

দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং আনন্দলাভের জন্য নিয়মিতভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করার নামই ব্যায়াম। ব্যায়াম দেহ ও মনকে বলিষ্ঠ এবং সংযত করে। ফলে শক্তি ও সহিষ্ণুতা বাড়ে, হৃৎপিণ্ড সতেজ হয়, হজমশক্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শরীরের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যায়ামের বিষয় নির্বাচন করতে হয়। পরিমিত ব্যায়াম স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সহায়ক। ব্যায়াম করার সময় তাড়াতুড়া করতে নেই। ব্যায়ামের মধ্যে কিছুক্ষণ বিরতির প্রয়োজন। এই বিরতি নতুন করে ব্যায়াম করার শক্তি যোগায়। অনিয়মিত, অসময় এবং যথেচ্ছা ব্যায়াম করা উচিত নয়। শিশুর দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যায়াম তথা শরীরচর্চা কর্মসূচিরও পরিবর্তন প্রয়োজন। পরিমিত ব্যায়াম দ্বারা দেহের অস্থি, মাস্পেশি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের সুস্থ বৃদ্ধি ঘটে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যায়ামের কর্মসূচি সহজ থেকে ক্রমশই কঠিন হবে। অর্ধাং ক্রমাগত উন্নত হবে। এভাবে ব্যায়াম অনুশীলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। ব্যায়াম অনুশীলনের কর্মসূচিতে দীর্ঘ বিরতি থাকবে না। ব্যায়াম অনুশীলনের সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যায়ামের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখতে হবে। যেমন: মাথা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে পা পর্যন্ত এসে শেষ করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের জন্য ব্যায়াম অপরিহার্য। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যায়াম ও খেলাধুলা বেশি প্রয়োজন। এ সময়ে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক গঠন দুট বৃদ্ধি পায়। ফলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শারীরিক কাঠামো সুদৃঢ় হয়।

কাজ-১ : শারীরিক সুস্থিতার জন্য ব্যায়ামের ভূমিকা বর্ণনা কর।

পাঠ-৪ : অতিরিক্ত ব্যায়ামের কুফল

আমাদের জীবনের সব ধরনের কর্মকাণ্ডেরই একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ রয়েছে। অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়। অধিক পরিমাণে খাবার গ্রহণ যেমন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তেমনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যায়ামও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আবার যখন-তখন ব্যায়াম করা ঠিক নয়। সকালে বা বিকেলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন ব্যায়াম করা উচিত। আবার খাবার গ্রহণের পরে ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয়। বয়স ও লিঙ্গ ভেদে ব্যায়াম নির্বাচন করা উচিত। যেমন:

১. শিশুদের ভারী জিনিস তোলার ব্যায়াম করালে অঙ্গপ্রতঙ্গের উন্নতি বা বৃদ্ধির চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে।
২. শিশুদের ৩০/৪০ মিনিটের বেশি ব্যায়াম করালে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়বে।
৩. এলোমেলোভাবে ব্যায়াম যেমন: একবার হাতের ব্যায়াম, পরে নিচে শুয়ে ব্যায়াম, তারপরে শক্তি বাড়ানোর ব্যায়াম—এভাবে ব্যায়াম না করে ধারাবাহিকভাবে ব্যায়াম অনুশীলন করতে হবে। তা না হলে শরীরের ক্ষতি হবে।
৪. ভরাপেটে ব্যায়াম পরিত্যাজ্য। খাওয়ার পরপরই ব্যায়াম করলে পেটে ব্যথা ও বমি হবে।
৫. ব্যায়ামের মধ্যে বিরতি না দিয়ে একধারে ব্যায়াম করলে শরীর অবশ হয়ে আসবে।
৬. ব্যায়াম করার পূর্বে শরীর গরম (warm up) করে নিতে হবে। শরীর গরম না করে ব্যায়াম শুরু করলে মাঝস্পেশিতে টান পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
৭. প্রথমে সহজ ব্যায়ামগুলোর অনুশীলন করিয়ে ক্রমাগতে কঠিনের দিকে যেতে হবে তা না হলে শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে।
৮. সকালে খালি পেটে ব্যায়াম করা উচিত নয়। খালি পেটে ব্যায়াম করলে বমি বা পেট ব্যথা শুরু হবে।

উল্লিখিত অতিরিক্ত ব্যায়ামের কুফলগুলো বিবেচনায় রেখে ব্যায়ামের বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। তাহলেই শারীরিক সুস্থিতা অর্জন করা সম্ভব হবে।

কাজ-১ : ব্যায়াম কী? কখন কীভাবে ব্যায়াম করা উচিত তার একটি তালিকা তৈরি কর।

কাজ-২ : অতিরিক্ত ব্যায়ামের কুফলগুলো লিখ এবং দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা কর।

পাঠ-৫ : সরঞ্জামবিহীন ব্যায়াম

আমাদের অনেকেরই এমন ধারণা রয়েছে যে সরঞ্জাম ছাড়া কোনো খেলাধুলা করা যায় না। এ ধারণা সঠিক নয়। সরঞ্জাম ছাড়াও নানা ধরনের ব্যায়াম করা যায়। সরঞ্জাম ছাড়া ব্যায়ামকে ‘ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ’ বা ‘মুক্ত হস্তে ব্যায়াম’ বলে। লাফালাফি, দৌড়ানৌড়ি, ডিগবাজি, হেডস্ট্যান্ড, পিটি বা সমবেত ব্যায়াম—এ সবই সরঞ্জামবিহীন ব্যায়ামের অঙ্গভূক্ত। সরঞ্জামবিহীন ব্যায়ামের কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেয়া হলো—

১. দম : খেলাধুলা করতে হলে দমের প্রয়োজন হয়। দম বা শারীরিক সহনশীলতা না থাকলে কোনো খেলাধুলায় সফলতা অর্জন করা যায় না। দম না থাকলে শরীরে শক্তি পাওয়া যায় না। ফলে তখন কোনো খেলা

ঠিকভাবে অনুশীলন করা যায় না। যেমন: অনবরত ইঁটলে বা একটানা দৌড়ালে দম বৃদ্ধি পায়। দম বৃদ্ধির জন্য নিচের ব্যায়ামের অনুশীলন করতে হবে।

১.১ একঘণ্টা ধীরগতিতে দৌড়াতে হবে। দৌড়ের মাঝে কোনো বিরতি থাকবে না।

১.২ একটানা দ্রুত হাঁটতে হবে- কখনো থামা যাবে না। এতে দম বৃদ্ধি পাবে।

১.৩ উচু-নিচু জায়গার উপর দিয়ে দৌড়াতে হবে। অবশ্য খেলোয়াড়দের বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে। এভাবে বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম করলে খেলোয়াড়দের দম বৃদ্ধি পাবে।

২. কজি ও কোমরের ব্যায়াম : র্যাকেট জাতীয় খেলাধূলার জন্য কজির শক্তি বেশি প্রয়োজন। যেমন: টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, ইত্যাদি। ক্রিকেট বল ব্যাটে লাগার সাথে সাথে কজির মোচড়ে যেকোনো দিকে বল পাঠানো যায়। ব্যাডমিন্টন খেলায় ম্যাশ করার সময় কজির শক্তি বেশি হলে ম্যাশ সফল হয়। বিভিন্নভাবে হাত ঘুরিয়ে কজির ব্যায়াম করা যায়। মাটিতে দুহাত রেখে শরীর উপরে-নিচে তুললেও কজি তথা হাতের শক্তি বাড়ে। চিন আপ, পুশ আপও কজির শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। কোমরের ব্যায়াম করতে হলে শরীর বিভিন্নভাবে অর্ধাং ডানে বামে ঘুরিয়ে কোমরের ব্যায়াম করতে হয়। পিঠে কাউকে তুলে নিয়ে শরীর আপ-ডাউন করলেও কোমরের শক্তি বাড়ে। এভাবে ব্যায়াম করে কজি ও কোমরের শক্তি বৃদ্ধি করা যায়।

৩. কনুই তেঙ্গে বসে ব্যায়াম : মাটিতে পা সামনে সোজা রেখে বসতে হবে। হাত দুটি শরীরের দুপাশে মাটির উপর থাকবে। এরপর হাতের উপর ভর দিয়ে শরীর উপরে তুলতে ও নামাতে হবে। শরীর উপরে নিচে উঠা-নামা করার সময় পা দুটো একত্র ও সোজা থাকবে।

কাজ-১ : সরঞ্জামবিহীন ব্যায়াম বলতে তোমরা কী বুঝি?

কাজ-২ : দুটি সরঞ্জামবিহীন ব্যায়াম প্রদর্শন কর।

পাঠ-৬ : সরঞ্জামসহ ব্যায়াম

সরঞ্জাম নিয়ে যে ব্যায়াম করা হয়, তাকে সরঞ্জামসহ ব্যায়াম বলে। সরঞ্জাম বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে খেলাধূলার সরঞ্জাম থেকে ব্যায়ামের সরঞ্জাম ভিন্ন। যেমন- স্কিপিং রোপ, রোমান রিং ও ফ্রিজিবি ইত্যাদি।

৬.১ স্কিপিং : স্কিপিং রোপের মাধ্যমে যে ব্যায়াম করা অর্ধাং লাফানো হয় তাকে স্কিপিং বলে। নানাভাবে স্কিপিং করা যায়।

ক. ৮/১০ জন এক লাইনে দাঁড়িয়ে স্কিপিং করতে করতে দৌড়িয়ে সামনে যাবে ও ফিরে আসবে।

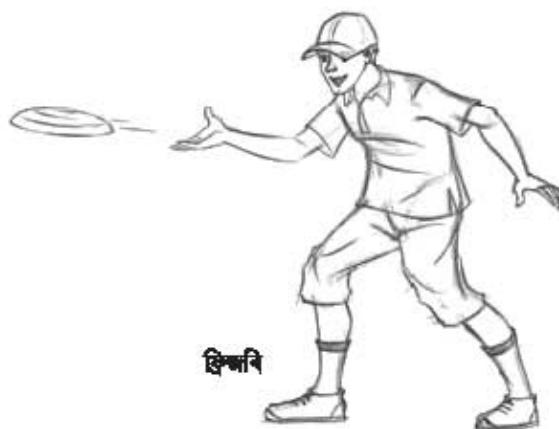
খ. এক জায়গায় দাঁড়িয়ে স্কিপিং করা যায়। একটানা ৫ মিনিট সবাই স্ব স্ব জায়গায় দাঁড়িয়ে স্কিপিং করবে।

গ. আবার ৬টি স্কিপিং রোপ ১০ ফুট অন্তর অন্তর দুজন দুমাথা টেনে ধরল। প্রথমটি ২ ফুট উঁচুতে, পরেরটি ৩ ফুট উঁচুতে এভাবে পর পর স্কিপিং রোপ ধরতে হবে। শিক্ষার্থীরা ফাইলে দাঁড়াবে। একজন একজন করে দৌড়ে প্রথমটির উপর দিয়ে লাফ দিয়ে পার হয়ে এবং পরেরটির নিচ দিয়ে এভাবে স্কিপিং রোপ অতিক্রম করতে হবে। যে অল্প সময়ে স্কিপিং রোপগুলো ক্রস করে ফিরে আসতে পারবে তার শক্তি ও শরীরের নমনীয়তা ভালো বলে গণ্য হবে।

৬.২. গ্রামান রিং : দুটি পাশির সাথে দুটি লোহার রিং ঝুলানো থাকে, একে গ্রামান রিং বলে। এই রিং থেরে বিভিন্ন কায়দায় নানাপ্রকার ব্যায়াম করা যায়। গ্রামের স্কুলগুলোতে পাহের ভালের সাথে বেথে অথবা বীশ দিনের আড়া বানিয়ে সেখানেও গ্রামান রিংয়ের রশি বৈধে এ ব্যায়াম করা যায়। বেমন-

- (ক) দুই হাত দিনের সুইং করে বিভিন্ন কায়দায় দেল খাওয়া যায়।
- (খ) রিং থেরে সুইং পা সামলে একজু করে পাহের 'এল পজিশন' করা।
- (গ) রিং থেরে হাতের উপর জড় করে যাবা নিচের দিকে এনে হ্যাভস্ট্যাই করা ইত্যাদি।

৬.৩. ক্রিকেট : ক্রিকেট ধারার মতো সিস্টেমিক প্রাস্টিকের একটি গোল চাকতি বিশেষ। আবাসের তৈরি বলে এটি হালকা হয়। হেলেমেজেরা এ দিয়ে খেলতে অচূর আনন্দ পায়। একজন এই চাকতি থেরে দুরে ঝুঁকে দেবে অপরজন সে চাকতি থেরে এই প্রাপ্ত থেকে শুনোর ঝুঁকে দেবে। এভাবে ২/৩ অন বা ৩/৪ অনের মধ্যে হোড়াছুঁড়ি করে খেলা যায়। এই হোড়াছুঁড়ি খেলাকেই ক্রিকেট বলে। এ খেলার মাধ্যমে হাতের শক্তি বৃক্ষি পাওয়া।



পাঠ-৭. ব্রহ্মচারী ব্যায়াম বা লোকজ ব্যায়াম

শারীরিক ব্যায়াম ও সুস্থির দেহ পঠনের জন্য চিকিৎসিলোকনের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ ব্যায়াম ঘারা সে অঞ্চলের কৃতি, অথা অভূতি কৃতিরে কোলা যায়। একে হ্যায়চারীসের ধরণিকে বেমন চিকিৎসিলোকন হয়, অপরাদিকে বিভিন্ন অঞ্চলের কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সহজ হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগীতির মাধ্যমে বে লোকজ ব্যায়াম করা হয়, এ সবই হলো ব্রহ্মচারী ব্যায়াম বা লোকজ ব্যায়াম। ব্রহ্মচারী ব্যায়াম হলো : ১. কাঠি নাচ ২. বুমুর নাচ ৩. লাড়ি নাচ

নিচে বুমুর নাচের বর্ণনা করা হলো—

বুমুর নাচ :

নাচের কৌশল—

- ক. শিকার্থীরা সুই সারিতে দোড়াবে। এক সারিতে কম সংখ্যক এবং অপর সারিতে বেশি সংখ্যক শিকার্থীরা থাকবে। ছোট সারিটি বড় সারির বাব দিকে দোড়াবে।
- খ. প্রথম সংকেত হওয়ার সাথে সাথে সকলে লাক দিয়ে গা জেড়া ও কোমরে হাত দিয়ে দীড়াবে।
- গ. বিজীয় সংকেতে সুই সারির সকলে সৌভ অকথ্য বাব দিকে মূরতে মূরতে দুটি বৃত্ত বানাবে। ছোট বৃত্তের বাইরে বড় বৃত্তটি থাকবে।
- ঘ. ফুজীয় সংকেতে পাত্র মাঝ বৃত্তের তেকজোর দিকে মুখ করে নিজ জায়গায় দোড়াবে। বাজনার ভালে গা উঠানামা করতে থাকবে। হাত দুটি প্রসারিত করে দূরবৃ ঠিক করে নিবে।
- ঙ. চতুর্থ সংকেতে পাত্রের উঠা-নামা থামাবে এবং সাথে সাথে হাত সুই পাশে চলে আসবে।

- চ. পঞ্চম সংকেতে দুই হাত কোমরে দিয়ে বৃত্তের বাম দিকে ১ থেকে ৭ স্টেপ ফেলবে। তিন গণনায় দুই হাত সামনে-নিচে আসবে। এভাবে দুইবার করতে হবে।
- ছ. ষষ্ঠ সংকেত শোনামাত্র বাম হাত মাথার বাম পাশ দিয়ে ১ থেকে ৭ স্টেপ ফেলবে ও তিন গণনায় হাত নিচে চলে আসবে।
- জ. সপ্তম সংকেতে ডান হাত মাথার ডান পাশ দিয়ে ১ থেকে ৭ স্টেপ ফেলবে। প্রত্যেকবার তিন গণনার সময় হাত নিচে আসবে।
- ঝ. অষ্টম সংকেতে দুই হাত মাথার উপরে আসবে ও ১ থেকে ৭ স্টেপ ফেলবে। এভাবে বাজনার তালে তালে নৃত্য এগুতে থাকবে।

ঝুমুর নাচের গান-

আগো ডালে বসা কোকিল

মাঝ ডালে বাসারে-

ভাঙ্গিল বিরিখির ডাল

জীবনে নেই আশারে।

অকালে পুষিলাম পাখি

ঘিরত মধু দিয়ারে-

সুকালে পালাইলেন পাখি

দারুণ শেল দিয়ারে।

অকালে পুষিলাম পাখি

খুদ কঁড়া দিয়ারে-

সুকালে পালাইলেন পাখি

দারুণ শেল দি যোরে।

ঝুমুর নৃত্যের মাদলের বোল

ধাতিন তাতাক্ তিন্ধা ধাতিন্ ধাতিন্ তাতাক্ থি

ধাতিন তাতাক্ তিনধা ধাতিন্ ধাতিন্ তাতাক্ থি

ধাতিন তাতাক্ তিনধা ধাতিন্ থি, থি, থি।

কাজ-১ : স্কিপিং রোপ ধারা কর প্রকারের ব্যায়াম করা যায়। প্রদর্শন করে দেখাও।

কাজ-২ : ফ্রিজবি কী? ফ্রিজবি খেলাটি প্রদর্শন কর।

পাঠ- ৮ : এডুকেশনাল জিমন্যাস্টিজ্য

আধুনিক জিমন্যাস্টিজ্যের সূচনা জার্মানিতে হলেও এর লক্ষ্য ছিল শুধু বলিষ্ঠ দেহ গঠন। কিন্তু শরীর ও মনের সুসমবিত্ত উন্নয়নের লক্ষ্য যে ব্যায়াম করা হয়, তাকে শিক্ষামূলক জিমন্যাস্টিজ্য বলে। এর উদ্দেশ্য হলো –

১. শিক্ষামূলক জিমন্যাস্টিজ্য অনুশীলনের ফলে শিশু ক্রমাগতে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জন করতে পারে।
২. বিদ্যালয়েই শিশুর নৈতিক গুণাবলি অর্জিত হয়।
৩. শিক্ষামূলক জিমন্যাস্টিজ্যের অনুশীলনগুলো পরিকল্পনামাফিক হয় বলে বাস্তব জীবনে এর প্রভাব পড়ে।

এডুকেশনাল জিমন্যাস্টিজ্যের কয়েকটি ব্যায়ামের উদাহরণ দেয়া হলো –

- ক. সম্মুখ ডিগবাজি : দুই ইঁটু ভাঙ করে, দুই পারের পাতা ও দুই হাতের তালুর উপর ভর করে থাক। এরপর কোমর উপরের দিকে তুলে ঘাঢ় ও মাথা দুই হাতের মধ্য দিয়ে চুকিয়ে সামনে গড়িয়ে পড়। মেঝেতে পা সৰ্প করার সাথে সাথে সোজা হয়ে দাঁড়াও। ডিগবাজি খাওয়ার সময় মাথা ঘাতে মাটিতে বা ম্যাটে না লাগে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।



- খ. পিছনে ডিগবাজি : যেদিকে ডিগবাজি দেবে সেদিকে পিছন কিরে দাঁড়াও। তারপর শরীরটা ক্রমাগত নিচু করে এবং শরীরের পিছনের অংশ অর্ধাৎ নিতম্ব মেঝেতে বা ম্যাটে লাগার সাথে সাথে দুই হাতের তালু কাঁথ বরাবর ম্যাটের দুই পাশে রাখ এবং শরীরটা পিছনে ঝুরিয়ে নাও। কোমর থেকে শরীরের উপর অংশ তুলে দাঁড়াবার জন্য পা মাটি ছোঁয়ার সাথে সাথে হাতের তালু দিয়ে ঘাটিতে ধাক্কা দাও এবং সোজা হয়ে দাঁড়াও।



গ. পার্শ্ব ডিগবাজি : সম্মুখ ডিগবাজির ন্যায় ম্যাটের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে শরীরের এক পাশে বা কাঁধে ভর করে কাত অবস্থায় শরীরটা ঘুরিয়ে নাও। ঘোরার সময় আঘাত এড়ানোর জন্য এক হাত ম্যাটের উপর পেতে দেবে এবং পা মাথার কাছে টেনে নেবে। এবার কাঁধের সাহায্যে একপাশে গড়িয়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াও।

কাজ-১ : এডুকেশনাল জিমন্যাস্টিক্স বলতে কী বুঝ? বর্ণনা কর।

কাজ-২ : ফ্রেস্ট রোল দেওয়ার কৌশলগুলো প্রদর্শন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। একজন সুস্থ লোকের দৈনিক কত ঘন্টা ঘুমানো প্রয়োজন?

ক. ২/৩ খ. ৭/৮

গ. ৮/১০ ঘ. ১০/১২

২। দেহের কোষগুলো কর্মক্ষমতা হারায়-

- i ফুটবল খেলার ফলে
- ii গাড়ী চালানোর ফলে
- iii গাড়ীতে বসে গান শোনার ফলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রাজু একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই বল নিয়ে মাঠে চলে গেল। কিন্তু মাঠে কোনো খেলোয়াড়কে না পেয়ে সে একাকী এক ঘন্টা অবিরাম দৌড়াদৌড়ি করল। অতঃপর বাসায় এসে হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা করল।

৩। রাজু যে ব্যায়ামটি করল তা কোন ধরনের?

ক. পরিমিত ব্যায়াম খ. অনিয়মিত ব্যায়াম

গ. নিয়মতান্ত্রিক ব্যায়াম ঘ. সরঞ্জামবিহীন ব্যায়াম

৪. নিয়মিত এ ধরনের ব্যায়াম সরঞ্জামসহ করলে রাজুর কোনটি ঘটতে পারে?

ক. সুঅভ্যাস গড়ে উঠবে খ. হৃৎপিণ্ড সতেজ হবে

গ. হজমশক্তি বৃদ্ধি পাবে ঘ. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতি হবে

৫। সময়োপযোগী পোশাক পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেহকে-

i. আরামদায়ক করা

ii. আবহাওয়া উপযোগী করা

iii. জীবানন্মুক্ত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

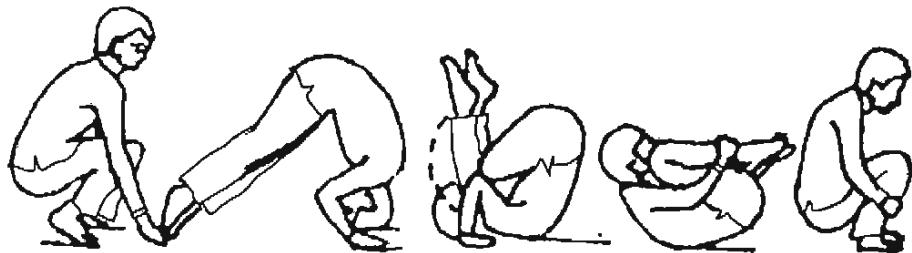
৬। শিশুদের দৈনিক কত মিনিট ব্যায়াম করা উচিত?

- | | | | |
|----|----|----|----|
| ক. | ১০ | খ. | ২০ |
| গ. | ২৫ | ঘ. | ৩৫ |

৭। কোনটি সরঞ্জামবিহীন ব্যায়াম

- | | | | |
|----|--------------|----|-----------|
| ক. | ফিপিং রোপ | খ. | ফিজিবি |
| গ. | হেডস্ট্যান্ড | ঘ. | রোমান রিং |

নিচের উদ্দীপাটি পড় এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



চির-১

চির-২

চির-৩

চির-৪

৮. উপরে উল্লেখিত কোন ব্যায়াম বা খেলার ফলে কজির শক্তি বৃদ্ধি পাবে?

- | | | | |
|----|-------|----|-------|
| ক. | চির-১ | খ. | চির-২ |
| গ. | চির-৩ | ঘ. | চির-৪ |

৯. চির-১ অর্জিত যোগ্যতা নিচের কোন খেলায় অর্জন করা যায়?

- | | | | |
|----|-----------|----|-----------|
| ক. | হ্যান্ডবল | খ. | ভলিবল |
| গ. | ক্রিকেট | ঘ. | বাস্কেটবল |

১০. ওয়ার্ম আপ না করে ব্যায়াম করলে কি সমস্যা হতে পারে?

- | | | | |
|----|--|----|---|
| ক. | অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে | খ. | শরীর ক্লান্ত হয়ে যেতে পারে |
| গ. | মাংশপেশিতে টান পড়তে পারে | ঘ. | অভ্যন্তরীন অঙ্গগুলো নিক্রিয় হয়ে যেতে পারে |

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং



স্কাউট ও গার্ল গাইড বিশ্বব্যাপী একটি অরাজনৈতিক সমাজসেবামূলক যুব আন্দোলন। বৃটিশ সেনাবাহিনীর তৎকালীন লেফটেন্যান্ট জেনারেল রবার্ট স্টিফেন্সন খিলখালি পাওয়েল ১৯০৭ সালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং এবং ১৯১০ সালে গার্ল গাইডের ধারণা প্রবর্তন করেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং কার্যক্রম আরম্ভ করার আগে স্কাউটিংয়ে অংশ নিতে পারে, এমন বয়সের ছেলেছেরদের চাহিদা বিবেচনা করে তিনি কিছু বই প্রকাশ করেন। তার যথে স্কাউট শাখার জন্য ১৯০৮ সালে 'স্কাউটিং কর বয়েজ' এবং গার্ল গাইড আন্দোলনের জন্য 'গার্ল গাইডিং' ও 'দি বু বার্ড বুক' অন্যতম। আজোকালি স্কাউট আন্দোলনের সাথে সংগৃহি রেখে বাংলাদেশেও বাংলাদেশ স্কাউটস ও গার্ল গাইডের কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়। যুক্তিযুক্তের আধ্যাত্মিক বাংলাদেশ স্বাধীনতা দাত করার পর ১৯৭২ সালে

বাংলাদেশে স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং-এর কার্যক্রম শুরু হয়। দৃঢ়স্থ মানবতার সেবা, নেতৃত্ব মূল্যবোধের উন্নয়ন, সুসংগঠিত শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, ধর্মীয় সহনশীলতা প্রভৃতি পুনৰাবলি অর্জনের সহায়ক শক্তি হিসেবে স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং আন্দোলন বিশ্বব্যাপী অশসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশও এই কার্যক্রমে পর্বিত অংশীদার হিসেবে ইতোমধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- ১। স্কাউটিং কার্যক্রমের চীকৃতিবজ্রপ বিভিন্ন ব্যাজ অর্জনসহ স্কাউট ও গার্ল গাইডিং-এর অন্যান্য কর্মসূচির ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ২। স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং-এর মাধ্যমে সুশৃঙ্খল জীবনবাপনে উন্নুন হব।
- ৩। প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান এবং প্রযোজনীয় সিকান্দ নিতে পারব।
- ৪। মৈলদিন জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসার সেবা প্রয়োগ করতে পারব।

পাঠ-১ : স্কাউট ও গার্ল গাইডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কর্মসূচি

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ছিলেন স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৮৫৭ সালে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। স্কাউটিং পদ্ধতিতে ইংল্যান্ডের বালকদের চরিত্রের বিভিন্ন গুণাবলির উন্নতি দেখে তিনি সারা বিশ্বে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেন। ১৯২০ সালে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা গঠিত হয়। বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রধান কার্যালয় সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় অবস্থিত। স্কাউট একটি বিশ্বজনীন অরাজনৈতিক সমাজসেবামূলক যুব আন্দোলন। স্কাউট আন্দোলনের লক্ষ্যই হচ্ছে একজন স্কাউটকে চরিত্রবান করে আদর্শ মানুষে বৃপ্তিরিত করা। স্কাউটিং কার্যক্রম বালকদের আত্মনির্ভর ও সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে সহায়তা করে। ভারত বিভাগের পর

১৯৪৮ সালে ঢাকায় পূর্ববঙ্গ স্কাউট সমিতি গঠিত করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশের স্কাউট আন্দোলন এক নতুন রূপ নেয়। ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল ঢাকায় দেশের স্কাউট নেতাদের এক সাধারণ সভায় বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি গঠিত হয়। ১৯৭৪ সালের ১ জুন বিশ্ব স্কাউট সংস্থা বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতিকে বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সে ১০৫তম সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৮ সালের ১৮ জুন ৫ম কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতির নাম বদল করে 'বাংলাদেশ স্কাউট' রাখা হয়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার কাকরাইলে এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। জেলা শহর গাজীপুরের অদুরে মৌচাকে স্কাউটের জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অবস্থিত।

রবার্ট স্টিফেনশন স্থিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল গার্ল গাইডেরও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি স্কাউটের অনুরূপ মেয়েদের জন্যও আলাদা কর্মসূচি দিয়ে নাম দিলেন গাইডিং। অতপর এই আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তার বোন এগনেসকে দায়িত্ব প্রদান করেন। এগনেস তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

গাইডিং মেয়েদেরকে

- ক) ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে।
- খ) সামাজিক চেতনাবোধ বৃদ্ধি করে।
- গ) দায়িত্বশীল নাগরিক হবার শিক্ষা দেয়।
- ঘ) সেবামূলক কাজ করার শিক্ষা দেয়।
- ঙ) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যুব সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে সাহায্য করে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদ গার্ল গাইড এ্যাসোসিয়েশনকে একটি জাতীয় সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আইন পাস করে। ১৯৭৩ সালে এই সংগঠন বিশ্ব গার্ল গাইড এ্যাসোসিয়েশনের পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বেহলি রোডে গার্ল গাইডের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

কাজ-১ : স্কাউট ও গার্ল গাইড সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারণা দেবেন।

পাঠ-২ : উপদল (পেট্রোল) ও ব্যাজ পদ্ধতি :

স্কাউট ও গাইডদের সকল কাজ উপদল (পেট্রোল) পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। এই পদ্ধতিতে ছয় থেকে আটজন স্কাউট ও গাইড নিয়ে একটি উপদল গঠিত হয়। উপদল কার্যক্রম পরিচালনা, উপদল পতাকা বহন ও উপদল

সদস্যদের বিভিন্ন কাজে সাহায্যের জন্য প্রত্যেক উপদল থেকে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নেতৃত্বদানে সক্ষম স্কাউট/গাইডকে নিয়ম মোতাবেক উপদল নেতা নিয়োগ করা হয়। উপদলের অন্যান্য সদস্যদের বিভিন্ন দায়িত্ব থাকে। প্রত্যেক উপদলের আলাদা নাম, চিহ্ন, পরিচয়ের ডাক এবং কার্যক্রম পরিচালনার স্থান থাকে। উপদলের বিভিন্ন কার্যবলি পরিচালনার সুবিধার জন্য সবার নাম ঠিকানা এবং অন্যান্য পরিচিতি মনে রাখতে হয়। মনে রাখার সুবিধার জন্য ডাইরি বা নোট বুকে সবার নাম-ঠিকানা শিখে রাখতে হয়।

উপদল পদ্ধতি ছেলেমেয়েদের সচেতন করার জন্য সবচেয়ে উত্তম পছন্দ। লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল সর্বপ্রথম ভাবতে এ পদ্ধতি চালু করেন। তারপর এই পদ্ধতি পৃথিবীর সব স্কাউট ও গাইড দলের মধ্যে প্রচলন করা হয়। উপদল পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ছেলেমেয়েদেরকে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি ছেলেমেয়ে বুঝতে পারে, তার উপদলের উন্নতির জন্য তার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। উপদল পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি স্কাউট ও গাইড কোম্পানি পর্যন্ত তার মতামত শৈঘ্রতে পারে এবং তারা তাদের নিজ উপদলের (পেট্রোলের) সুবিধা অনুযায়ী কোম্পানির কার্যক্রম, পরিকল্পনা ইত্যাদি বাস্তবায়িত করতে পারে। এ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে প্রতিটি স্কাউট ও গাইড আত্মনিরশীল হয়ে ওঠে এবং নিজ পরিবার ও সমাজ সম্পর্কে দায়িত্বশীল হয়।

উপদল পতাকা : উপদল পতাকা ত্রিকোণাকার সাদা জমিনবিশিষ্ট হবে।

পতাকার মাঝখানে উপদলের নামের প্রাণি/পাখির মুখমণ্ডল আঁকা থাকবে।

উপদলের পতাকাদণ্ড স্কাউট লাঠির সমান। উপদল পতাকার পরিমাপ হবে ৩০ সেন্টিমিটার × ২০ সেন্টিমিটার।



টেক্সারফুট ব্যাজ : এই ব্যাজের মোট চারটি রং সবুজ, হলুদ, শাল ও সাদা।

সবুজ : আমাদের দেশের জাতীয় পতাকার রং থেকে নেওয়া হয়েছে। এই রং-এর অর্থ তারুণ্যের উদ্দীপনা, সংজ্ঞিতা। এই রং আমাদের চারিপাশে গাছপালার মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

হলুদ রং : সোনালী আঁশ থেকে নেওয়া হয়েছে।

শাল : রক্তক্ষয়ী সংস্থামের মাধ্যমে যে নতুন সুর্যের উদয় হয়েছে এটা তার প্রতীক।



টেক্সারফুট ব্যাজ

চারটি সাদা স্তরক : এর অর্থ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের চারটি মন্ত্রনীতি। বৃক্ষ, হাতের কাজ, শাস্ত্র ও সেবা। সাদা রং এর অর্থ পবিত্র, নির্মল ও ভাস্তুজ্ঞের চিহ্ন। গাইডও এই রং-এর মত পবিত্র, নির্মল ও একে অপরের ভগ্নি।

ত্রিপত্রঃ তিনটি পাপড়ি হলুদ রং-এর অর্থ গাইড প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশ।

ডেট : মেহ, মার্চ, মমতা, ভালবাসা।

শাড়িতে যদি ব্যাজ লাগানো অসুবিধা হয় তা হলে ব্রাউজের কলারে বাম দিকে ব্যাজ লাগানো যায়।

এই ব্যাজের উপর অন্য কোন ব্যাজ লাগানো যাবে না। যেহেতু কষ্ট করে এই ব্যাজ অর্জন করা হয় সেহেতু অন্য ব্যাজগুলি টেক্সারফুট ব্যাজের নীচে লাগানো যাবে। টেক্সারফুট ব্যাজকে প্রতিজ্ঞা (promise) ব্যাজ বলে।

টেক্সারফুট পরীক্ষায় পাশ করার পর এবং দীক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার পর ফুল ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় শুধুমাত্র এই ব্যাজ পরা যায়। এই ব্যাজ বাম দিকে পরাতে হয়। যদি টাই থাকে তবে টাইয়ের মাঝখানে ব্যাজ পরাতে হয়।

ক) দক্ষতা ব্যাজ ও গাইড লেপুণ্ডসূচক ব্যাজ : দক্ষতা ব্যাজ প্রদান করা হয় নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের উপর দক্ষতা অর্জনের সীকৃতি স্বীকৃত হয়। দক্ষতা ব্যাজ হলো চারটি-

- (১) সদস্য ব্যাজ (২) স্ট্যাভার্ড ব্যাজ (৩) প্রোগ্রেস ব্যাজ ও (৪) সার্ভিস ব্যাজ।
 (১) সদস্য ব্যাজ স্কাউট শার্টের বাম পকেটের মাঝখানে সেলাই করে পরতে হয়।
 (২) স্ট্যাভার্ড ব্যাজ শার্টের বাম হাতের তাঁজের উপর কনুই ও কাঁধের মাঝখানে সেলাই করে পরতে হয়।
 (৩) প্রোগ্রেস ব্যাজ স্ট্যাভার্ড ব্যাজের স্থলে লাগাতে হয়।
 (৪) সার্ভিস ব্যাজ প্রোগ্রেস ব্যাজ সবিলে তার স্থানে সেলাই করে পরতে হয়।

গাইড লেপ্টনস্কুল ব্যাজ:

- | | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| ১. গ্রান্থী | ২. অর কল্যা | ৩. আধিমিক চিকিৎসা | ৪. যাচিনী |
| ৫. বাহ্য প্রতীক | ৬. পৃথিবীপুনা | ৭. অভিযান সেবিকা | ৮. বুনন প্রতীক |
| ৯. রক্ষণী | ১০. সূচী শিখী | ১১.ইস-মুরগী পালন | ১২.শুধুযামগ্রী |
| ১৩. সেলাই | ১৪. কৃষি | ১৫.স্যানিটেশন | |
| ১৬. ভোল রিহাইজেশন খেরাণী (ও আর টি) | | | |

৬) পাইদর্শিতা ব্যাজ : বিভিন্ন বিষয়ের উপর পাইদর্শিতা অঙ্গনের স্বীকৃতি প্রদানের নির্দেশন হলো পাইদর্শিতা ব্যাজ। বর্তমানে বিশেষ তিস্তি ব্যাজ প্রসার ঘূর্ণসহ মোট ১৬টি ঝুল্পে পাইদর্শিতা ব্যাজের সংখ্যা ১২৬টি। পাইদর্শিতা ব্যাজ স্কাউট শার্টের ঢান হাতের কনুই ও কাঁধের মাঝে সেলাই করে পরতে হয়।

কাজ-১ : স্কাউট ও গার্ল হাইডের উপদল পক্ষতি ও ব্যাজ পক্ষতির ধারনা ব্যাখ্যা কর।

কাজ-২ : ব্যাজ পক্ষতির নামগুলো শোনাতের অদর্শন কর।

কাজ-৩ : কোন ব্যাজ কোথায় পরতে হয় তা অভিযন্ত করে দেখাও।

পাঠ-৩ : পাইভনিয়ারিং, ল্যাশিং ও টেকারলেপ্ট পিলা

১) পাইভনিয়ারিং: স্কাউটিং ও গার্ল হাইডিং-এ হাইকিং করার সময় তাঁবুবাসকালে সড়ির বিভিন্ন পেরো সম্পর্কে জানা ও বাস্তবে প্রয়োগ করাকে পাইভনিয়ারিং বলে। বেমন-

- ১) সড়ির বিভিন্ন অংশের নাম জানা ও চিহ্নিত করতে পারা।
- ২) সড়ির সাহায্যে নিম্নলিখিত গোরোপুলো বাঁধতে এবং এপুলোর সঠিক ব্যবহার শৈর্ষণ করতে পারবে। বেমন: বেলাইন অন দি বাইচ, ক্যাটস গ, চৰল পিটবেক্ট, ট্রিপারি পিটবেক্ট, কামার ম্যান চেয়ার নট ইত্যাদি। **টেকারলেপ্ট পিলা**
- ৩) সঠিক শ্যাচের সাহায্যে চারাটি শাঠি দিয়ে একটা গৱাক্ষ সড় তৈরি করতে পারা।
- ৪) সঠিক শ্যাচের সাহায্যে একটা পিলার লেপ তৈরি করতে পারা।

গ্যাজেট : তাঁবুতে বসবাসের জন্য গাছের ঢাল বা বাঁশ দিয়ে তৈরি আসবাবপত্র রাখার ব্যবস্থাকে গ্যাজেট বলে।

৫) **ল্যাশিং :** দু-তিনটা বাঁশ বা কাঠকে একত্রে বাঁধার জন্য সড়ি দিয়ে পেটিয়ে বাঁধাকে ল্যাশিং বলে। সাধারণত গুল, অর, মাচা, গ্যাজেট তৈরি ও পাছে ঠেকা দেরার সময় ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। ল্যাশিং

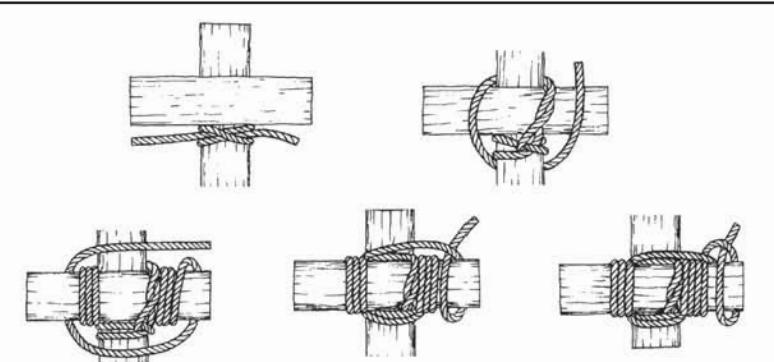


অনেক থকার থাকলেও স্কাউটদের প্রাথমিক পর্যায়ে চার থকার ল্যাশিংয়ের প্রয়োজন হয়। যথা -

- ১। স্কোয়ার ল্যাশিং (Square Lashing) ।
- ২। ডাইগ্রাগোনাল ল্যাশিং (Diagonal Lashing) ।
- ৩। পোল এণ্ড শিয়ার ল্যাশিং (Pole and Sheer Lashing) ।
- ৪। ফিগার অব এইট ল্যাশিং (Figure of eight Lashing) ।

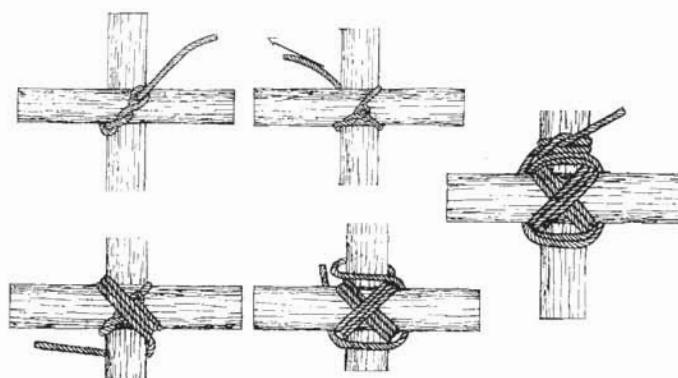
স্কোয়ার ল্যাশিং (Square Lashing) : একটি বাঁশের উপর আরেকটি বাঁশ আড়াআড়িভাবে রেখে শক্ত করে বাঁধার জন্য যে পেঁচ দেয়া হয়, তাকে স্কোয়ার ল্যাশিং বলে। একটি বাঁশ মাটির উপর খাড়াভাবে রেখে অপর একটি বাঁশের টুকরা ঐ বাঁশের উপর আড়াআড়ি রাখতে হবে। যে বাঁশটি খাড়াভাবে আছে, সেটি হচ্ছে পোল এবং যে বাঁশটি আড়াআড়িভাবে রাখা হয়েছে, সেটি হচ্ছে বার। এবার পোল এবং বার যেখানে মিলিত হয়েছে, সেখানে একটি বড়শি গেরো দিয়ে ঐ দড়ির চলমান অংশকে বারের উপর দিয়ে পোলকে পেছন দিক থেকে পেছিয়ে আবার বারের উপর রাখতে হবে। এভাবে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে ৮/১০ বার পোল এবং বারকে জড়িয়ে পেঁচ দিতে হবে। পোল পেঁচানোর সময় দড়ি পোলের নিচে এবং উপরের প্রথমে যে দুটি পেঁচ দেয়া হয়েছিল, পরবর্তী পেঁচগুলো দুটির মধ্যে দিতে হবে। যাতে আস্তে আস্তে পোলের এই অংশের কাঁক বন্ধ হয়ে যায়।

পোল এবং বার ৮/১০ বার পেঁচানো শেষ হলে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে পোল এবং বারের মাঝে যে দড়ি আছে, তাকে শক্ত করে অন্ততপক্ষে ৩/৪ বার পেঁচাতে হবে। এই



স্কোয়ার ল্যাশিং

ফ্রাপিং যত শক্ত হবে, ল্যাশিং তত মজবুত হবে। ফ্রাপিং দেয়া শেষ হলে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে বারে বড়শি গেরো দিয়ে বেঁধে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। এতাবে স্কোয়ার ল্যাশিং বাঁধতে হয়।



ডাইগ্রাগোনাল ল্যাশিং

ডাইগ্রাগোনাল ল্যাশিং (Diagonal Lashing) : একটি দড়কে অপর একটি দড়ের উপর কোনাকুনিভাবে বাঁশগুচ্ছ টিহেন (X) মতো অবস্থায় রাখতে হবে। এভাবে রাখার ফলে দুটি দড় যেখানে একত্রিত হয়েছে, সেখানে একটি গাড়ি টানা গেরো দিতে হবে। দড়ির চলমান অংশের দিক পরিবর্তন করে বাইরের দিক দিয়ে

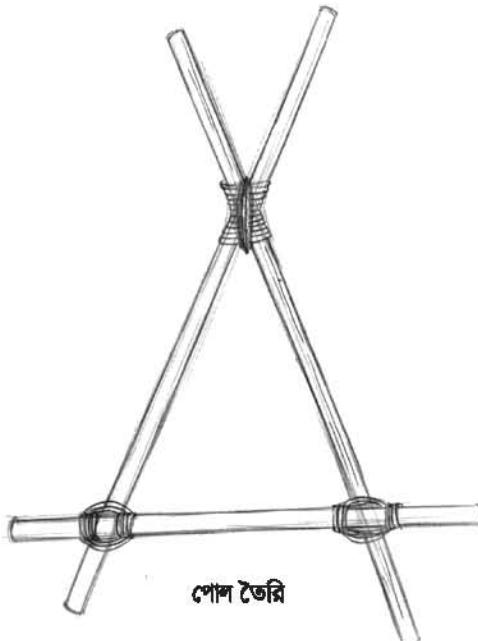
দুই দণ্ডকে একত্রে ৫/৭ বার পেঁচাতে হবে। এরপর যে দিক থেকে আগে পেঁচানো হয়েছে তার বিপরীত দিক থেকে দুই দণ্ডকে একত্রিত করে আগের মতো ৫/৭ বার পেঁচ দিতে হবে। এভাবে দুই দিক দিয়ে পেঁচানো শেষ হলে দণ্ডের মাঝে দড়ির যে অংশ আছে, তাকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে শক্ত করে অস্ততপক্ষে ৩/৪ বার পেঁচ দিতে হবে। এই পেঁচ যত শক্ত হবে ল্যাশিং তত মজবুত হবে। ফ্রাপিং দেয়া শেষ হলে যেকোনো একটি দণ্ডের সাথে দড়ির চলমান অংশের দ্বারা বড়শি গেরো দিয়ে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। এভাবে ডায়াগোনাল ল্যাশিং বাঁধতে হয়।

কাজ-১ : স্কোরার ল্যাশিং ও ডায়াগোনাল ল্যাশিং বেঁধে প্রদর্শন কর।

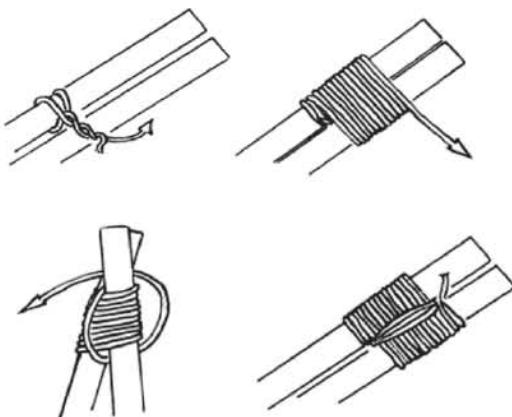
পাঠ-৪ : পোল এন্ড শিয়ার ও ফিগার অব এইট ল্যাশিং

পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিং (Pole and Shear Lashing) : পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিংকে অনেকে শুধু শিয়ার ল্যাশিং বলে। দুটি বাঁশ বা কাঠকে একত্রে বাঁধার জন্য যে পেঁচ দেয়া হয়, তাকে পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিং বলে। দুটি বাঁশ বা দণ্ডকে একত্রে বেঁধে তাকে পায়া হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অথবা একটি বাঁশ বা দণ্ডকে অপর একটি বাঁশ বা দণ্ডের সাথে বেঁধে তাকে লম্বা করার জন্য এই ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। যখন দুটি বাঁশ বা দণ্ডকে মাথার দিকে একত্রে বেঁধে তাকে পায়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে শিয়ার লেগ বলে। যখন একটি বাঁশ বা দণ্ডকে অপর একটি বাঁশ বা দণ্ডের সাথে একত্রে বেঁধে লম্বা করা হয় তখন তাকে পোল বলে। মূলত শিয়ার লেগ এবং পোল তৈরির জন্য একই ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। শিয়ার লেগ ও পোল করার জন্য একই ল্যাশিং ব্যবহার করা হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন— শিয়ার লেগ তৈরির জন্য ফ্রাপিং দিতে হয়। আর পোল তৈরির জন্য ফ্রাপিং দিতে হয় না। কীভাবে পোল তৈরি ও শিয়ার লেগ তৈরি করা হয় তা নিম্নে পৃথকভাবে দেয়া হলো—

পোল তৈরি : একটি দণ্ডের মাথায় ২০ সেমি: নিচে অপর একটি দণ্ডের নিচের অংশ রেখে দণ্ডকে আগের দণ্ডের পাশাপাশি রেখে নিচে রাখা দণ্ডটি, যেখানে উপরের দণ্ডের সাথে মিলিত হয়েছে, তার ৪/৫ সেমি: উপরে দুটি দণ্ডকে একত্রিত করে সেখানে দড়ির স্থির অংশ দিয়ে বড়শি গেরো বাঁধতে হবে। বড়শি গেরো বাঁধার পর দড়ির স্থিরপ্রাণের যে বাঢ়তি অংশ থেকে যাবে, তাকে দড়ির চলমান অংশের সাথে পেঁচিয়ে দিতে হবে। তারপর চলমান অংশ দিয়ে দুটি দণ্ড একত্র করে নিচের দিক থেকে উপরের দিকে পেঁচ দিতে হবে। ৮/১০ বার পেঁচ দেওয়া হয়ে গেলে দণ্ডকে একত্র করে বড়শি গেরো দিয়ে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। দুটি দণ্ড যেখানে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছে, সেখানে আলাদা আলাদা ল্যাশিং দিলে সুবিধা হয় এবং বাঁধন খুব শক্ত হয়। দণ্ড কোনো দিকে হেলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এভাবে পোল তৈরির জন্য পোল ল্যাশিং বাঁধতে হয়।



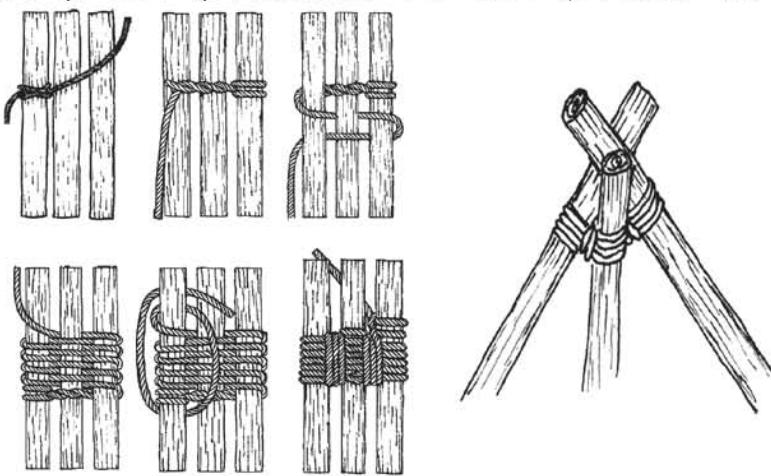
শিয়ার লেগ তৈরি : দুটি বাঁশ বা দড়ের নিচের অংশ সমান্তরাল রেখায় রেখে দুটি দড়কে একত্র করে উপরের যেকোনো দড়ে দড়ির স্থির প্রান্ত দিয়ে একটি বড়শি গেরো দিতে হবে। বড়শি গেরো দেয়ার পর দড়ির স্থিরপ্রান্তের বাড়তি অংশ থেকে যাবে, তাকে দড়ির চলমান অংশের সাথে পেঁচিয়ে দিতে হবে। এবার দড়ির চলমান অংশ দিয়ে দুটি দড়কে একত্র করে পেঁচিয়ে নিচ থেকে উপরের দিকে যেতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যে দুটি দড়ের সাথে পেঁচ দেওয়ার সময় একটি দড়ির সাথে যেন আরেকটি দড়ি লেগে থাকে। একটি দড়ি যেন আর



শিয়ার লেগ

একটি দড়ির উপর না উঠে। ৮/১০ বার পেঁচ দেওয়া শেষ হলে দুই দড়ের মাঝখানে দড়ির যে অংশ আছে, তাকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে শক্ত করে অস্তু পক্ষে ৪/৫ বার পেঁচ দিতে হবে। দুই দড়ের মাঝখানের দড়িকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে পেঁচনোকে ফ্রাপিং (Frapping) বলে। ফ্রাপিং যত মজবূত হবে ত্যাপিং তত শক্ত হবে। ফ্রাপিং দেয়া শেষ হলে প্রথমে যে দড়ে বড়শি গেরো দিয়ে ল্যাশিং শুরু করেছিল তার বিপরীত দড়ে বড়শি গেরো দিয়ে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। এভাবে শিয়ার লেগ তৈরি করা হয়।

ফিগার অব এইট ল্যাশিং (Figure of Eight Lashing) : তিনটি দড়ের নিচের অংশকে একই সমান্তরাল রেখায় রেখে দড় তিনটিকে একটির পাশে আর একটি রাখতে হবে। দড় তিনটি খুব কাছাকাছি থাকবে। যেকোনো দুটি দড়কে বড়শি গেরো দিয়ে বাঁধতে হবে। বড়শি গেরোর মাথা যেন দড়ের উপর



ফিগার অব এইট ল্যাশিং

থাকে। বড়শি গেরো বাঁধার পর দড়ির স্থির প্রান্তের যে বাড়তি অংশ থেকে যাবে, তাকে দড়ির চলমান অংশকে একটি দড় বাদ দিয়ে পরবর্তী দড়কে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নিচ থেকে উপরের দিকে যেতে হবে। কমপক্ষে ৫/৭ বার দড়ি পেঁচনো শেষ হলে যে দড়ের সাথে প্রথম বড়শি গেরো বাঁধা হয়েছিল সে দড়ের পার্শ্ববর্তী দড়ের মাঝখানে দড়ির যে অংশ আছে সে দড়িকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে প্রথমে কমপক্ষে তিনবার পেঁচ দিতে হবে।

পরবর্তীতে পাশের দুই দড়ের মাঝখানে দড়ির যে অংশ আছে তাকে আবার আগের মতো করে পেঁচ দিতে হবে। এভাবে দড়ির উপর দড়ি দিয়ে পেঁচ দেওয়াকে ফ্রাপিং বলে। ফ্রাপিং যত শক্ত হবে, ল্যাশিং তত মজবৃত হবে। ফ্রাপিং দেয়া শেষ হলে বড়শি গেরো দিয়ে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। তিনটি দণ্ড বা বাঁশকে একত্রে বেঁধে ট্রিপট তৈরি করার জন্য ফিগার অব এইট ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়।

কাজ-১ : পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিং ও ফিগার অব এইট ল্যাশিং তৈরি করে দেখাও।

পাঠ-৫ : প্রাথমিক চিকিৎসা/প্রতিবিধান

প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞানের আগে প্রাথমিক চিকিৎসা কী তা তোমরা যষ্ট শ্রেণিতে ধারণা পেয়েছো। প্রাথমিক চিকিৎসা বা প্রতিবিধান চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি অংশ। প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে হঠাতে কোনো পীড়া বা দৈব দুর্ঘটনায় হাতের কাছের জিনিসের দ্বারা রোগীকে প্রাথমিকভাবে সাহায্য করা, যাতে ডাঙ্কার আসার আগে রোগীর অবস্থার অবনতি না ঘটে বা জটিলতা সৃষ্টি না হয়। অর্থাৎ যেকোনো আকঘিক দুর্ঘটনায় প্রথম শুশুরা এবং সর্বক্ষণ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যে উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হয়, তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা / প্রতিবিধান বলা হয়।

রক্তক্ষরণ : রক্ত হলো এক প্রকার তরল পদার্থ। এর রং লাল। হিমোগ্লোবিন নামক লাল রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতিতে রক্তের রং লাল দেখায়। শরীরের কোনো স্থানে আঘাতের ফলে বা কেটে গেলে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, এবং সেই ক্ষত হতে যে রক্ত বের হয়, তাকে রক্তক্ষরণ বা রক্তপাত বলে। বিভিন্নভাবে রক্তক্ষরণ হতে পারে যেমন-

১। মুখ দিয়ে রক্ত পড়া : মুখের ভিতরের যেকোনো অংশ থেকে রক্তপাত হলে বরফ চুম্বতে হবে। তাহলে রক্তপাত বন্ধ হবে। এরপর রোগীকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হবে।

২। নাক দিয়ে রক্ত পড়া : আঘাতজনিত বা অন্য কোনো কারণে কারো নাক দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করলে তৎক্ষণাৎ তাকে চিত করে শোয়াতে হবে অথবা বসিয়ে মাথা পেছনের দিকে হেলিয়ে রাখতে হবে। কাপড়চোপড় টিলা করে দিতে হবে। নাকের সামনে ও ঘাড়ের পিছনে ঠাণ্ডা কমপ্রেস দিতে হবে। তখন মুখ দিয়ে শ্বাসকার্য চালাতে হবে। রক্তপাত বন্ধ হবার পরও কিছুক্ষণ নাকের ছিদ্রপথে তুলো দিয়ে রাখতে হবে।

৩। শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে: কাটা স্থানটি কিছুক্ষণ পরিষ্কার হাতে চেপে ধরতে হবে। রক্ত বন্ধ হলে ব্যাঙ্গেজ দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে। সাধারণত তিনটি উৎস থেকে রক্তপাত হয়। যথা-

ক) কৈশিক নালি (Capillary) -একটানা স্ন্যাতের ন্যায় রক্ত বের হয়।

খ) শিরা (Vein) -গলগল করে রক্ত বের হয়।

গ) ধমনী (Artery) - ফিলকি দিয়ে রক্ত বের হয়।

দুর্ঘটনায় বেশির ভাগ রক্তপাত হয় কৈশিক নালি থেকে।

রক্তপাতের প্রাথমিক চিকিৎসা :

১। রোগীকে বসানো ও শোয়ানো যায় এমন স্থানে স্থানান্তর করতে হবে। এতে রক্তপাত আপনা-আপনি কমে যাবে।

২। যে স্থান হতে রক্তপাত হচ্ছে, সে স্থান হ্রৎপিণ্ডের সমতার উপর ভুলে ধরলে রক্তপাত অনেকটা কমে যাবে।

- ৩। সামান্য কেটে গেলে ঐ স্থানে রক্ত জমাট বেঁধে আপনা-আপনি রক্তপাত বন্ধ হয়।
- ৪। কাটা স্থানে বৃক্ষাঙ্গুলির চাপ প্রয়োগ করলে অনেক সময় রক্তপাত বন্ধ হয়।
- ৫। আহত অঞ্চলের নড়াচড়া বন্ধ করতে হবে।
- ৬। রক্তপাতের স্থানে বরফ ব্যবহার করতে হবে।
- ৭। রক্তপাত বন্ধের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপ দিতে হবে।
- ৮। ক্ষতস্থান পরিষ্কার কাপড় বা ব্যাটেজ দিয়ে বাঁধতে হবে।
- ৯। তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে নিতে হবে।
- ১০। বেশি রক্তপাত হলে টুর্নিকেট ব্যবহার করতে হবে। টুর্নিকেট অর্থ হলো প্রাথমিক বাঁধনকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শক্ত করে তোলা। ক্ষতস্থান টিলা করে বেঁধে তার ভিতরে একটি কাঠি বা পেঙ্গিল ঢুকিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরালে বাঁধনটি ভূমশ শক্ত হয়ে রক্তপাত বন্ধ হয়।

বৈদ্যুতিক শক : আজকাল শহর ও শহরতলি এবং গ্রামেও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বহু জায়গায় অপরিকল্পিত ও অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার ফলে যেকোনো সময় তড়িতাহত হয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিদ্যুৎপ্রবাহ বা কারেন্ট দুই ধরনের। এসি (AC) কারেন্ট ও ডিসি (DC) কারেন্ট। এসি কারেন্ট আকর্ষণ করে টেনে নেয়। ডিসি কারেন্ট শুধু ধাক্কা দেয়। সে জন্য এসি কারেন্ট বেশি মারাত্মক। তেজা কাপড় বা গাছের সাথে বিদ্যুৎপ্রবাহের সংযোগের ফলে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এগুলো শ্রেষ্ঠ করলে নিজেও তড়িতাহত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

বিদ্যুৎস্ফুর্ট হলে : কারো শরীরে বিদ্যুতের তার জড়িয়ে গেলে বা কেউ বিদ্যুৎস্ফুর্ট হলে সাথে সাথে মেইন সুইচ বন্ধ করে দিতে হবে। কোনো কারণে সুইচ বন্ধ করতে না পারলে শুকনা কাঠ দিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে ছাড়িয়ে দিতে হবে। কাঠ না পেলে শুকনা কাপড় হাতে জড়িয়ে ধাক্কা দিতে হবে। কখনো খালি হাতে ধরলে বিদ্যুৎস্ফুর্ট হয়ে বিপদ ঘটতে পারে। কখনো গায়ে পানি দেবে না। শ্বাসক্রিয়া না চললে কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য চালাতে হবে। তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখাতে হবে।

মচকানো : হাড়ের সংযোগ স্থান সঞ্চালনের সময় হঠাৎ মচকে গেলে বা বেঁকে গেলে সংযোগ স্থান সংলগ্ন ম্লায়ুতন্ত্রের উপর টান পড়ে বা ছিঁড়ে গিয়ে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয় তাকে মচকানো বলে। ব্যায়াম, খেলাধুলা বা অন্যান্য কাজকর্মের সময় মাঝে মাঝে ব্যথা পাওয়া বা মচকানো অস্বাভাবিক নয়। এসব দুর্ঘটনার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু অনেক সময় চিকিৎসকের সাহায্য পেতে দেরি হয়। তাই আহত ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসার দরকার হয়।

লক্ষণ :

- ১। আহত স্থানে ব্যথা অনুভূত হবে।
- ২। সন্ধিস্থল ফুলে যাবে।
- ৩। আহত স্থান বিবর্ণ হয়ে নীল বা লাল আকার ধারণ করবে।
- ৪। স্বাভাবিকভাবে নড়াচড়া করা যাবে না এবং চলার সময় আহত স্থানে ব্যথা বৃদ্ধি পাবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা :

- ১। আঘাতের সাথে সাথে আহত স্থানে ঠাণ্ডা পানি বা বরফ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ২। আহত স্থানটি নড়াচড়া করতে দেয়া যাবে না।

- ৩। মচকানো স্থানটি যথাসম্ভব আরামদায়ক অবস্থায় রাখতে হবে।
- ৪। আহত স্থানে হাড়ভাঙার ব্যান্ডেজ প্রয়োগ করতে হবে।
- ৫। ব্যান্ডেজ সব সময় ভিজা রাখবে। সম্ভব হলে বরফ লাগাবে।
- ৬। মাস্পেশি মচকে গেলে রোগীকে সহজ ও আরামদায়ক অবস্থায় শোয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ৭। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে ডাক্তার বা হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কামড়, দণ্ডন বা হুল ফোটা : বিভিন্ন জন্ম-জননোয়ারের কামড় থেকে সাবধান থাকতে হবে। পাগলা কুকুরের মুখের লালায় জলাতৎক রোগের জীবাণু থাকে। কুকুর, নেকড়ে, শিয়াল, বেঞ্জি ও ছুঁচো-এরা সবাই জলাতৎক রোগের জীবাণু বহন করে। এরা কামড়ালে সাথে সাথে আহত স্থানে কার্বনিক সাবান বা পানি দিয়ে আহত স্থানটি ভালোভাবে ধূয়ে ফেলতে হবে এবং তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। বিড়ালের নখ খুব তীক্ষ্ণ। বিড়াল থেকে ডিপথেরিয়া রোগ হয়। বিছা, মৌমাছি ও ভীমরূপের কামড় মারাআক। এরা হুল ফুটিয়ে বিষ থলি থেকে হুলের পথে বিষ চেলে দেয়। অনেক সময় হুলটি ভেঙে গিয়ে দণ্ডন স্থানে লেগে থাকে। যদি হুল ফুটে থাকে তবে ক্ষতের চারদিকে চাপ দিয়ে হুলটি বের করে নিতে হবে।

সাপে কামড়ালে কামড়ের জায়গার উপরে কাপড় বা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধতে হবে। এর ফলে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হবে এবং বিষ ছড়াতে পারবে না। ধারালো ত্রৈড দিয়ে আহত জায়গা একটু গভীর করে কেটে (আধা সে: মি:) রক্ত বের করে ফেলতে হবে। ৩০ মিনিটের বেশি সময় বেঁধে রাখলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে নিচের অংশে পচন ধরতে পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের নিকট বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

চোখে কিছু পড়লে : চোখ মানুষের অমূল্য সম্পদ। নানা কারণে চোখ দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারে। চোখে ধূলোবালি পড়তে পারে। কাজ করার সময় কিছু ছিটকে এসে চোখে বিধতে পারে, কোনো রাসায়নিক পদার্থ চোখে পড়তে পারে। এরূপ কিছু চোখে পড়ে গেলে –

- ১। কখনই চোখ কচলানো যাবে না।
- ২। চোখে পানির ঝাপটা দিতে হবে।
- ৩। রোগীকে আলোর দিকে মুখ করে বসিয়ে আলতোভাবে চোখের দুটি পাতা খুলে দেখতে হবে। চোখে কোনো বস্তু লেগে থাকলে রুমালের কোনা ভিজিয়ে আলতোভাবে ত্বাশ করার মতো লাগিয়ে বস্তুটি তুলে নিতে হবে।
- ৪। রাসায়নিক কিছু চোখে পড়লে দুধ দিয়ে ধূয়ে ফেলতে হবে।
- ৫। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বা হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কানে কিছু গেলে : কানে পোকামাকড় চুকে গেলে সরিষার তেল বা অগ্নিভ ওয়েল অঞ্চ পরিমাণ চেলে দিলে পোকা মরে যায় এবং বের হয়ে আসে। তাছাড়া মার্বেল জাতীয় কোনো কিছু চুকে গেলে নড়াচড়া না করে দ্রুত ডাক্তারের নিকট বা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

অজ্ঞান অবস্থায় করণীয় : দেহের স্নায়ুতন্ত্রের কাজের বিষ্ফল ঘটলে রোগীর জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। এ অবস্থাকে অজ্ঞান বা অচেতন অবস্থা বলে। বিভিন্ন কারণে মানুষ অজ্ঞান হয় যেমন- রোগবশত, দুর্ঘটনাজনিত, বিষক্রিয়াজনিত এবং তাপের তারতম্যজনিত কারণে। এ অবস্থায় প্রাথমিকভাবে যা করতে হবে-

- ১। রোগীকে ফাঁকা ও বায়ুপূর্ণ স্থানে নিয়ে যেতে হবে।
- ২। রোগীর জামা-কাপড়, জুতা, মোজা, কৃত্রিম দাঁত থাকলে খুলে নিতে হবে।

- ৩। রোগীকে চিৎ করে শুইয়ে পর্যবেক্ষণ করে কী করণীয় তা স্থির করতে হবে।
- ৪। লোক বেশি হলে সরাতে হবে।
- ৫। রক্তস্ফুরণ হলে তার প্রতিবিধান করতে হবে।
- ৬। কোনো উদ্ভেজক পানীয় বা খাদ্য খাওয়ানো যাবে না।
- ৭। বিষজনিত কারণে অজ্ঞান হলে রোগীকে উপুড় করে বুকের নিচে বালিশ দিয়ে শুইয়ে দিতে হবে। রোগীর দুটি পা ইঁটু হতে উপরের দিকে তাঁজ করে দিতে হবে। রোগীর
- ৮। জ্বান ফেরার জন্য মুখে পানির ঝাপটা দিতে হবে। গরম চা বা কফি খাওয়াতে হবে।
- ৯। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।

কাজ-১: বাড়িতে, বাড়ির বাইরে, খেলার মাঠে ঘটতে পারে এমন কয়েকটি দুর্ঘটনার নাম উল্লেখ কর।

কাজ-২: খেলার মাঠে আঘাত পেয়ে নাক দিয়ে রক্ত পড়লে প্রাথমিক চিকিৎসা কীভাবে দেওয়া হয় তা বর্ণনা কর।

কাজ-৩ : গত তিন মাসে তোমাদের বাড়িতে কেউ দুর্ঘটনায় পড়েছিল কি না তা নিচের ছকে পূরণ কর
(দলগত কাজ)

পরিবারের সদস্য	দুর্ঘটনার ধরণ
১। মা	
২। বাবা	
৩। বোন	
৪। ভাই	
৫। গৃহকর্মী	

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘দি বু বার্ড বুক’ বইটি কাদের জন্য লেখা?
 - ক. হলদে পাখি
 - খ. গার্ল গাইড
 - গ. বয়েজ স্কাউট
 - ঘ. রোভার স্কাউট
২. বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রধান কার্যালয় কোথায়?
 - ক. লন্ডন
 - খ. জেনেভা
 - গ. ঢাকা
 - ঘ. নয়াদিল্লী
৩. গার্ল গাইডের প্রতিষ্ঠাতা কে?
 - ক. লর্ড ব্যাডেন পাওয়াল
 - খ. লেডি ব্যাডেন পাওয়াল
 - গ. এগনেস
 - ঘ. হেনরী ভোনান্ট

৪. উপদল পদ্ধতির সুবিধা -

- i. কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হয়
- ii. স্কাউট শ্রেণির চিহ্নিত করা যায়
- iii. সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫। উপদল পতাকায় পাট কোন রঙ নির্দেশ করে?

- ক. সবুজ খ. হলুদ গ. লাল ঘ. সাদা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

এস. আর মাদ্রাসার স্কাউট গ্রন্থের ছাত্ররা বার্ষিক তাবুবাস, জাম্বুরী ও সকল স্কাউট কার্যক্রমে অংশ নেয়। প্রতি বছরই তারা বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কার লাভ করে। তবে জি. এম মাদ্রাসার ছাত্ররা স্কাউট কার্যক্রমে নিক্রিয় ছিল। কিন্তু এস. আর মাদ্রাসার সাফল্যে উদ্বৃদ্ধ হয়ে জি. এম মাদ্রাসার ছাত্ররা স্কাউট কার্যক্রমে সক্রিয় হয়ে উঠে এবং বিভিন্ন বিষয়ে অংশ নেয়।

৬। এস. আর মাদ্রাসার ছাত্ররা কোনটিতে পারদর্শিতা অর্জন করেছে?

- ক. প্রাথমিক প্রতিবিধান খ. গ্যাজেট তৈরি গ. টেক্নোলজি ব্যাজ তৈরি ঘ. স্যানিটেশন

৭। জি. এম মাদ্রাসার ছাত্ররা কোনটিতে সক্রিয় হয়ে উঠে?

- ক. সেলাই খ. কৃষি গ. স্যানিটেশন ঘ. ল্যাশিং

৮। গ্যাজেট কী?

- | | |
|--|---|
| ক. বিভিন্ন গেরো সম্পর্কে জানা | খ. কয়েকটি বাঁশকে দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা |
| গ. বাঁশ দিয়ে আসবাবপত্র রাখার ব্যবস্থা করা | ঘ. কোম্পানীর কার্যক্রম পরিচালনা করা |

৯। উপদল পতাকায় সাদা রঙ কী নির্দেশ করে?

- | | |
|-----------------------|------------------|
| ক. তারংশ্যের উদ্দীপনা | খ. সোনালী আঁশ |
| গ. নতুন সূর্যোদয় | ঘ. ভাত্তের চিহ্ন |

১০. গার্ল গাইডের উদ্দেশ্য কী?

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ক. নিজেকে বড় মনে করা | খ. নিজের আর্থিক সুবিধা লাভ করা |
| গ. সেবা করার জন্য তৈরি থাকা | ঘ. সহপাঠীদের বিরোধ মিমাংসা করা |

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পরিচিতি ও স্বাস্থ্যসেবা

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে আজ কিশোর-কিশোরীসহ অনেকের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিশোর-কিশোরী যারা মাদকদ্রব্য সেবন করে তারা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে। অনেকে লেখাপড়া ছেড়ে দেয় ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। যেসব দ্রব্য সেবন করলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে ও নেতৃত্বাচক পরিবর্তন ঘটে এবং এগুলোর প্রতি আসক্তি জন্মে, সেগুলোই হলো মাদকদ্রব্য।



বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

১. মাদকদ্রব্য ও মাদকাস্তু ইওয়ার কারণ জানতে পারব।
২. ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে মাদকের পরিগতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
৩. ধূমপান ও মাদকের বিষয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হব।
৪. ধূমপান ও মাদকের পরিগতি উপলব্ধি করে পরিশীলিত জীবনযাপনে উদ্বৃক্ষ হব।

পাঠ-১ : মাদক ও মাদকাস্তু

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও মাদকের ব্যবহার উৎপেক্ষনক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে পরিবার তথা সমাজের সর্বস্তরের জনগণ উদ্বিগ্ন। সমবয়সী বা খারাপ সহপাঠীদের পাঞ্চায় পড়ে কৈশোরে মাদক সেবনে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং মাদক গ্রহণের ফলে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের জীবন নষ্ট হচ্ছে। যেসব দ্রব্য সেবন করলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে এবং আসক্তি জন্মে সেগুলোই মাদকদ্রব্য। যেমন— গীজা, হেরোইন ইত্যাদি। মাদক সেবন করলে লেখাপড়ায় মন বদে না, বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক ও

অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। ফলে মাদকসেবনকারীর নিজের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার পরিবার ও সমাজ। আমরা সবাই ওষুধের সাথে পরিচিত। কোনো অসুখ হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা ওষুধ খাই। কোনো কোনো ওষুধকে আবার ব্যবহারগত কারণে মাদকদ্রব্য বলা হয়। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ খেলে এবং এর প্রতি আসক্তি জন্মালে সে ওষুধ মাদকদ্রব্যের আওতায় পড়ে।

যারা মাদকদ্রব্য সেবন করে, মাদকদ্রব্যের প্রতি তাদের শারীরিক ও মানসিক নির্ভরশীলতার সৃষ্টি হয়। ফলে মাদকের প্রতি যেমন তাদের তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তেমনি মাদকদ্রব্য গ্রহণের পরিমাণ দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। যদি কোনো কারণবশত তারা মাদকদ্রব্য সেবন করতে না পারে, তখন তাদের মধ্যে মাদকের অভাবজনিত কারণে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন- মেজাজ খিটমিটে হয়, ক্ষুধা কমে যায় এবং আচরণ আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে।

মাদকাসক্তি : তোমরা তোমাদের আশেপাশে অনেককে ধূমপান করতে দেখো। বিড়ি, সিগারেট, চুরুট ও তামাকের ধোঁয়া সেবন করাকে বলে ধূমপান। আজকাল কিশোর-কিশোরী ও যুবসমাজের মধ্যে ধূমপানসহ অন্যান্য নেশার প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদকাসক্তি হলো মানসিক ও শারীরিক ক্ষতিকর এক প্রক্রিয়া, যা সেবনকারী ও মাদকের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। মাদকাসক্তি মাদকের প্রতি নেশাকে বুঝায়। যেসব দ্রব্য সেবন করলে আসক্তি সৃষ্টি হয়, জ্বাল ও স্থূলিশক্তি কমে যায়, সেগুলো হলো মাদকদ্রব্য। আমাদের দেশে যেসব মাদকদ্রব্য ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলো হলো- সিগারেট, বিড়ি, তামাক, চুরুট, মদ, গাঁজা, চরস, ভাঁৎ, মারিজুয়ানা, হেরোইন, ফেনসিডিল, ইয়াবা ইত্যাদি। কখনো কখনো ওষুধও মাদকদ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগুলোর মধ্যে যুমের ওষুধই বেশি। তোমাদের কি কখনো মনে হয়েছে কেন মাদকাসক্তি হয়? কেন তারা নেশা করে? এর প্রধান কারণ হলো মাদকাসক্তি সংজীবের সাথে মেলামেশা। অনেক সময় কিশোর-কিশোরীরা না বুঝেই বা এর খারাপ দিকগুলো না জেনেই বন্ধু-বন্ধুর ও সহপাঠীদের প্ররোচনায় নিতান্ত কৌতূহলবশে মাদকদ্রব্য সেবন করে এবং তা পরে আসক্তিতে পরিণত হয়। দেখা যায়, মাদক সেবনের ফলে মাদকের প্রতি প্রচল শারীরিক ও মানসিক নির্ভরতা সৃষ্টি হয়। একবার মাদকের নেশা হলে দেহ ও মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। ফলে সে বারে বারে মাদক গ্রহণ করে। এসব ব্যক্তির মাদকাসক্তি নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা, মনোচিকিৎসা এবং সহর্মিতা প্রয়োজন।

কাজ-১ : মাদকদ্রব্য সেবনে মানুষের আচরণে কী পরিবর্তন ঘটে?

পাঠ-২ : ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে মাদকের পরিণতি

পূর্বের পাঠে তোমরা মাদকদ্রব্য সম্পর্কে জেনেছ। মাদকদ্রব্য মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই মাদকের প্রভাব সেবনকারীর শরীর-মন এবং পরিবার ও সমাজের উপর পড়ে। এবার মাদক গ্রহণে সমাজে যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তা জেনে নাও।

- মাদকদ্রব্য মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। যেমন- শেখার ও কাজ করার ক্ষমতাহ্রাস করে, আবেগের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। চাপ সহ্য করার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে ব্যাহত করে। তাছাড়া মানসিক পীড়ন বাড়িয়ে দেয়।
- মাদকদ্রব্য পারিবারিক ও সমাজজীবনে নানারকম যন্ত্রণাদায়ক প্রভাব ফেলে। মাদকদ্রব্য সেবনকারী পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে উগ্র আচরণ করে। পরিবারের মানসিক শান্তি বিনষ্ট হয়।

৩. এগুলোর ব্যবহার শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। মাদকদ্রব্য সেবন মন্তিষ্ঠেকর স্নায়ুকোষকে ধ্বংস করে, সৃষ্টি অনুভূতি কমিয়ে দেয় এবং খাদ্যাভ্যাস নষ্ট করে।
৪. কিছু কিছু মাদক ইচ্চাইভি ও হেপটাইটিস-বি এর সংক্রমণের আশংকা বাড়িয়ে দেয়।
৫. মাদক গ্রহণের ফলে এগুলোর উপর সেবনকারীর শারীরিক ও মানসিক নির্ভরতা তৈরি হয়, যা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না।
৬. মাদক গ্রহণ করলে যে সমস্ত জটিল রোগ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে খাদ্যনালী ও শ্বাসনালীর ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস ও ব্লাড প্রেসার।
৭. তামাক ও তামাকজাতীয় মাদক শরীরের ভেতর প্রতিটি রক্তনালিতে প্রদাহের সৃষ্টি করে। এর ফলে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রক্ত চলাচল কমে যায়, কখনো রক্ত চলাচল একেবারেই বম্ব হয়ে যায়, কখনো বা রক্তনালি ফেটে যায়। ফলে হার্ট এটাক ও ব্রেইন স্ট্রোক হতে পারে।
৮. এ ছাড়া যারা দীর্ঘসময় ধরে ধূমপান করে তাদের শ্বাসত্ত্বের ক্ষতি হয়।
৯. মাদক ক্রয়ে আর্থিক ক্ষতি হয়। নেশার টাকার জন্য পরিবারে চাপ সৃষ্টি করে, কখনো কখনো আক্রমণ করে, রাস্তা-ঘাটে ছিনতাই করে টাকা-পয়সা ও মালপত্র লুট করে। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসার খরচ যোগাতে গিয়ে সংসারে অভাব দেখা দেয়। এসব ক্ষতিকর দিকগুলো পরিবার ও সমাজকে ধ্বংস করে ফেলে। সেজন্য মাদকদ্রব্য ও ধূমপান থেকে শুধু নিজেকে বিরত রাখলেই চলবে না, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠীসহ আশপাশের লোকজনকে এ থেকে বিরত রাখতে হবে। এসবের কুফল সম্পর্কে সকলকে জানাতে হবে এবং এগুলো সেবন না করতে উদ্ধৃত করতে হবে।

কাজ-১ : মাদকদ্রব্য গ্রহণের চারটি কুফল লেখ

- ১.
- ২.
- ৩.
- ৪.

কাজ-২ : উপরোক্ত কুফলগুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে মারাত্মক মনে হয়, সেটি প্রথমে, এর পর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য কুফলের তালিকা তৈরি কর। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তালিকাগুলো বোর্ডে প্রদর্শন কর।

পাঠ- ৩ : মাদকাসক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সমবয়সীদের প্রভাব

তোমরা জেনেছ মাদকাসক্ত ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত, পরিবারিক ও সামাজিক জীবনে অপ্রয়োগ্য ক্ষতি বয়ে আনে। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীরা অনেক সময় সমবয়সী ও বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে এবং কৌতুহলবশত মাদকাসক্ত হয়। এছাড়া একজন ব্যক্তির মাদকাসক্ত হওয়ার আরও কিছু কারণ আছে। যেমন- যে পরিবারের মা-বাবার মধ্যে সুসম্পর্ক থাকে না বা মা-বাবার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে, সে পরিবারের সন্তানেরা অনেক সময় বিপথগামী হয়ে মাদক গ্রহণ করে। দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, ব্যর্থতা ভুলে থাকার জন্যও অনেকে মাদক গ্রহণ করে। পরিবারের বাবা-মা বা অন্য কোনো সদস্য যদি নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে, তাহলে সেই পরিবারের সন্তানেরা সহজেই মাদকাসক্ত হতে পারে। আবার অভিভাবকের প্রশ্নয়েও এমন হতে পারে। দেশের সীমান্ত এলাকায় সহজেই মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়। ঐ সব এলাকার মাদক ব্যবসায়ীরা অন্যদের মাদকদ্রব্য গ্রহণে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে। এই প্রলোভনে পড়েও অনেকে মাদকাসক্ত হয়।

ইদানীঁ পাড়া-মহল্লায় কিছু কিছু দোকানি এবং বস্তির অনেকে মাদকদ্রব্য কেনাবেচা করে। তারাও বিভিন্নভাবে অন্যকে মাদক গ্রহণ করতে প্রতিবিত করে। তয়ৎকর হলেও সত্য যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ রকম চিত্র দেখা যায়। এভাবে একজন ব্যক্তি নানাভাবে মাদক গ্রহণ করতে উৎসাহিত হচ্ছে। মাদকাস্তু হওয়ার ক্ষেত্রে সমবয়সী, বন্ধু, সহপাঠী ও সঙ্গী-সাথীদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা দিনের অধিকাংশ সময়ই স্কুলে এবং বন্ধু বা সঙ্গী-সাথীদের সাথে কাটায়। সঙ্গী-সাথীদের কেউ যদি মাদকে আসন্ত হয়, তাহলে তার প্ররোচনায় বা নিজেরা কৌতুহলবশত মাদক সেবন করলে সে ধীরে ধীরে মাদকাস্তু হয়ে গড়ে। বন্ধু বা সাথীদের এ ধরনের কুপ্তভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রয়োজন আসচ্ছেনতা ও দৃঢ় মনোবল।

কাজ-১ : মাদকাস্তু ব্যক্তি পরিবার ও সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি বয়ে আনে। কথাটি কি ঠিক? ব্যাখ্যা কর।

পর্যটন-৪ : মাদকাস্তু প্রতিরোধ

মাদকাস্তুর ক্ষতিকর দিকগুলো তোমরা জেনেছ। সমাজে মাদকাস্তুদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদকের এই সর্বনাশ গ্রাস থেকে পরিবার ও সমাজের সদস্যদের রক্ষা করতে কি করণীয় তা তোমাদের জানা দরকার। মাদকাস্তু একটি সর্বনাশ রোগ। এ থেকে রক্ষা করার কৌশল সবার জানা প্রয়োজন। মাদকাস্তুর মতো কোনো ঘটনা ঘটার পূর্বেই এর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। সেই সাথে আসন্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এবার জেনে নাও মাদকাস্তু ব্যক্তি থেকে নিজ পরিবার ও সমাজকে কীভাবে রক্ষা করবে। এ জন্য তোমরা যা করতে পারো –

১. মাদকদ্রব্য ও এর অপব্যবহার সম্পর্কে এলাকার যুবসমাজকে এবং জনগণকে সচেতন করার জন্য পাড়ায় বা মহল্লায় মাদকবিরোধী সংগঠন ও ক্লাব গড়ে তোলা। এসব সংগঠনের মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার ও র্যালি পরিচালনা করা;
২. সামাজিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষক, ক্লীড়াবিদ, জনপ্রিয় অভিনেতা, শিল্পী এসব ব্যক্তিদের মাদকবিরোধী প্রচারণায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৩. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা;
৪. মসজিদের ইমামগণ জুমার নামাজের খুতবায়, মন্দিরে ও গির্জায় প্রার্থনায় এবং অন্যান্য জাতীয় দিবসে মাদকের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে পারেন;
৫. স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুলকে ধূমপান ও মাদকমুক্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করে এ সত্ত্বান্ত ব্যবস্থা নিতে পারে;
৬. মাদকের কুফল ও মাদকাস্তু ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার কিছু চিত্র পোস্টার স্কুলে, হাট-বাজারে ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টাঙ্গিয়ে জনগণকে সচেতন করা।

তোমরা জেনেছ মাদকাস্তু ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে কৌতুহলের বশে বা বন্ধুবান্ধবদের প্ররোচনায় মাদকদ্রব্য সেবন শুরু করে। এ ছাড়া রয়েছে হতাশা, একঘেয়েমি, বেকারত্ব, দুঃখ, যন্ত্রণা ইত্যাদি। এসব থেকে পরিত্রাণের জন্য যুবসমাজের জন্য খেলাধূলা, চিন্তবিনোদন ও শারীরিক প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কাজ-১ : তোমার এলাকার মাদকবিরোধী প্রচার চালাতে তুমি কী করবে?

কাজ-২ : মাদকবিরোধী র্যালিতে প্রচারণার জন্য তিনটি ক্লোগান তৈরি কর।

পাঠ-৫ : মাদক গ্রহণের চাপ মোকাবিলা

তোমরা পূর্বের পাঠসমূহে মাদকদ্রব্য, মাদকদ্রব্যের কুফল এবং এর প্রতিরোধ সম্পর্কে জেনেছ। এবার মাদকদ্রব্য গ্রহণের চাপ কীভাবে মোকাবেলা করবে সে সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে কীভাবে বিরত থাকা দরকার, তার কৌশল তোমাদের জানা থাকলে সহজেই মাদকমুক্ত জীবন গড়ে তুলতে পারবে। তোমার বন্ধু-বন্ধব বা সহপাঠী কেউ মাদকদ্রব্য সেবনের অনুরোধ করলে বা তোমার ওপর চাপ প্রয়োগ করলে তুমি কৌশলে তা এড়িয়ে যাবে। মাদকদ্রব্য গ্রহণের প্রস্তাৱ বা চাপ এড়ানো ও প্রত্যাখ্যানের উপায়-

- যেসব জায়গায় মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়, সেসব জায়গায় যাবে না। সেখানে বিভিন্ন ধরনের খারাপ লোক থাকে, তারা তোমাকে এসব মাদক গ্রহণে চাপ সৃষ্টি করতে পারে।
- যদি তোমার কোনো বন্ধু বা সহপাঠী তোমাকে কোনো ওষুধ বা ট্যাবলেট দিয়ে বলে, এটা খেলে তুমি বাঢ়তি শক্তি পাবে বা শরীর চাঞ্চা হবে, তখন এসব ওষুধ বা ট্যাবলেট গ্রহণ করবে না। বন্ধুকে এসব দ্রব্যের খারাপ দিক সম্পর্কে জানিয়ে তাকেও এসব গ্রহণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে।
- পাড়া / মহল্লায় বা স্কুলে যারাই মাদকদ্রব্য সেবন করবে, তাদের সাথে মিশবে না।
- যদি কোনো বন্ধু তোমাকে দোকানে বসে আজড়া দেওয়ার প্রস্তাৱ করে, তাকে বিনয়ের সাথে ‘না’ বলবে। ঐ সময় পড়ালেখা বা খেলাধূলা করে সময় কাটানো অনেক ভালো এ কথা তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে।
- ধূমপানসহ যেকোনো মাদকদ্রব্য সেবন ধর্মীয় দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। এই নিষেধ মনে চলবে।
- মানুষের জীবনে যেকোনো সময় দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে পারে। এর প্রতিকার মাদক গ্রহণ নয়, নিজের আত্মিয়তার ও মনোবল অটুট রাখতে হবে।
- অবসর সময়ে খেলাধূলা কিংবা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে সময় কাটাবে।
- সহসারে ছেটাখাটো কাজ করে বড়দেরকে সাহায্য করবে। এর ফলে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হবে।
- বন্ধু-বন্ধব মিলে সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করলে সমাজের উপকার হবে। নিজের মনে উদ্যম ও আনন্দের সঞ্চার হবে এবং মাদকমুক্ত থাকতে সহায়তা করবে।
- গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকমুক্ত থাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রাম্যাবাসী, হাসপাতাল, ডিনিক, প্রেস্কাগৃহ, থিয়েটার, শিশুপার্ক, পাবলিক পরিবহন, খেলার মাঠ ও রেস্টুরেন্টের অভ্যন্তরে ধূমপান করা যাবে না। এই আইন লংঘন করলে তিনশত টাকা অর্থদণ্ডের আইন করা হয়েছে (২০১৩)। লংঘনকারী ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরণের অপরাধ করলে তাকে পর্যায়ক্রমে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে অর্থদণ্ড দিতে হবে।

কাজ-১ : তোমার দুইজন ধূমপায়ী বন্ধু তোমাকে ধূমপান শুরু করার জন্য চাপ দিচ্ছে। তুমি কীভাবে এই চাপ প্রতিহত করবে? ব্যাখ্যা কর।

কাজ-২ : দুঃখ-কষ্ট ভোলার জন্য, রাগ-অভিমানবশত কিংবা কৌতুহলের কারণে ছেলেমেয়েরা মাদক গ্রহণের কথা ভাবে। কিন্তু তুমি স্থির করেছ যে কোনোভাবেই মাদক গ্রহণ করবে না। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তুমি কী করবে? ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. কোনো ব্যক্তির মাদকাসক্তি নিরাময়ের জন্য কোনটি বেশি প্রয়োজন?

- | | | | |
|----|------------------------|----|----------------------------|
| ক. | পড়ালেখায় মনোযোগী করা | খ. | বেড়াতে নিয়ে যাওয়া |
| গ. | ভাল আচরণ করা | ঘ. | খেলাধূলায় অঙ্গৰ্ভুক্ত করা |

২. কোনটি মাদকদ্রব্য নয়?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | চরস | খ. | মারিজুয়ানা |
| গ. | ক্যাফেইন | ঘ. | প্যাথেড্রিন |

৩. মাদকাসক্ত ব্যক্তির মাদকের অভাবে কোনটি ঘটে?

- | | | | |
|----|----------------------------|----|---------------------|
| ক. | খাবারের অরুচি হয় | খ. | ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় |
| গ. | বস্তু বান্ধবকে এড়িয়ে চলা | ঘ. | খাবারের চাহিদাহ্রাস |

৪. তামাক ও তামাক জাতীয় মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে কোনটি হতে পারে?

- | | | | |
|----|------------|----|--------------|
| ক. | সর্দি-কাশি | খ. | ইনফ্লয়েঞ্জা |
| গ. | হার্ট এটাক | ঘ. | ডায়াবেটিস |

নিচের উদ্ধীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রহিম ইদানিং প্রায়ই দেরি করে বাড়ি ফিরে। বাড়িতে এসে নিজের ঘরে চলে যায় এবং অন্যদের সাথে কথা বলে না। তাছাড়া পরিমিত ও নিয়মিত খাওয়া দাওয়া করে না। বাবা- মা রহিমের এই পরিবর্তনে ভীষণভাবে চিন্তিত।

৫. রহিমের এ ধরনের পরিবর্তনের কারণ কী হতে পারে?

- | | | | |
|----|--------------------|----|-------------------------|
| ক. | অতিরিক্ত পড়ার চাপ | খ. | বয়ঃসন্ধিকাল |
| গ. | মাদক দ্রব্য গ্রহণ | ঘ. | শিক্ষকের বকাবাকা খাওয়া |

৬. রহিমের এ অবস্থার প্রতিরোধে প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে-

- পারিবারিক উদ্যোগ
- মাদ্রাসার কর্মসূচি
- বস্তুবান্ধবের সহযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|----|---------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | ii ও iii |
| গ. | i ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

পি. এল মাদ্রাসার দেয়ালে লেখা ছিল ‘মাদকাসক্তি একটি সর্বনাশা ব্যধি’।

৭. দেয়াল লিখনটির মূল কথা-

- i. মাদক গ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর
- ii. মাদক গ্রহণ রোধে সচেতনতা
- iii. মাদক গ্রহণ নিষিদ্ধ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮. বিনা কারণে তোমার কোনো বন্ধু তোমাকে ট্যাবলেট খেতে দিলে তুমি-

- i. সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করবে
- ii. তোমার বন্ধুকে বুঝিয়ে না বলবে
- iii. এসব থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উভয় দাও।

করিম ও তার কয়েকজন সহপাঠী সমাজে মাদকাস্তি প্রতিরোধে একসাথে কাজ করে। মাদক সেবন প্রতিরোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম ও র্যালীতে তারা প্রতিনিয়ত বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। তারা মনে করে সমাজ একদিন মাদকমুক্ত হবেই।

৯. করিম মূলত মাদকসেবীদের জন্য কী সৃষ্টি করতে চাচ্ছে?

- ক. বন্ধুদের সুদৃঢ়তা খ. সচেতনতা বৃদ্ধি
গ. সুনাগরিকতা বোধ ঘ. সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য

১০. করিমের আশাবাদের পূর্ণতায় সমাজ উপকৃত হতে পারে-

- i. কর্মক্ষম যুবসমাজ সৃষ্টি করে
- ii. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির মাধ্যমে
- iii. নিজের অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও iii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

চতুর্থ অধ্যায়

বয়ঃসন্ধিকালের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা

একটি নবজাত শিশু বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের আদরে, স্নেহে বড় হয়ে ওঠে। এভাবে বাল্যকাল পার হয়ে কৈশোরে পদার্পণ করে এবং এর সাথে সাথে তার দ্রুত শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে। এই কৈশোরকাল হচ্ছে একটি শিশুর বয়ঃসন্ধিকাল। এ সময় শিশু-কিশোরদের সুস্থিতাবে বেড়ে উঠার জন্য পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের পাশাপাশি প্রয়োজন নিরাপদপরিবেশ। পরিবারের সকলের যত্ন ও ভালোবাসার মাঝে যে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর পরিবেশে একটি শিশু বেড়ে ওঠে, সে পরিবেশকে নিরাপদ পরিবেশ বলা হয়। এ রকম পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য মা-বাবাসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোনো কোনো পরিবারে নিরাপদ পরিবেশ দেখা যায় না। সেখানে শিশুরা প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হয়, বড়দের তিরক্ষার, বকুনি ও প্রহারের শিকার হয়। এরূপ আচরণের শিকার হলে তারা ভয়ে চুপ করে থাকে। এতে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। পরিবার ছাড়াও পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মায়ন্ত্রজন দ্বারা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুরা নিপীড়নের শিকার হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষার কৌশলসমূহ জানা খুবই প্রয়োজন। শিশুরা পরিবার থেকে, পরিবারের বড়দের ও স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখার কৌশল জেনে নেবে। এ ছাড়া বাল্যবিবাহ, যৌতুক, বিভিন্ন হয়রানি প্রভৃতির মতো সামাজিক সমস্যা সম্পর্কেও তারা জানবে এবং নিজেদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করবে।



বয়ঃসন্ধিকালের বালক-বালিকা

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

১. বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
২. বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার কৌশলগুলোর মাধ্যমে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে উদ্বৃদ্ধ হব।
৩. বয়ঃসন্ধিকালে নিরাপত্তাইনতার বিভিন্ন দিক বর্ণনা করতে পারব।
৪. বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক চাপ সামলানোর কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ-১ : বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা

পরিবারের নিরাপদ পরিবেশে শিশু-কিশোররা সুস্থিতাবে বেড়ে ওঠে। এজন্য তাদের পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য প্রয়োজন। নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য মা-বাবাসহ পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের দরকার রয়েছে। এ সময় শিশুরা আদর, স্নেহ, ভালোবাসার মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু অনেক পরিবারে শিশুদের সাথে খারাপ আচরণ, যেমন: বকাবকা, মারপিট, গালাগালি করা হয়। শিশুরা ভয়ে এ ধরনের শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের কথা কাউকে বলতে পারে না। কোনো কোনো শিশু আবার শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। শিশুগুরুমে নিয়োজিতদের বেলায় এটা দেখা যায়। বাল্যবিবাহ, যৌতুকপ্রথা কিশোরীদের

ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় বাধা। বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথার অভিশাপে একটি আনন্দ উচ্ছল কিশোরীর সকল স্বপ্ন ভেঙে যায়, সে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক নিপীড়নের শিকার হয়। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষ্ণু ঘটলে শিশুরা আতঙ্কগ্রস্ত থাকে এবং নিপীড়নের স্ফূর্তি তাদেরকে বিষ্ণু করে তোলে। তারা হতাশায় ভোগে। ফলে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিশুর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিষ্ণুকারী এসব নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে হলে শিশুর মা-বাবা বা অভিভাবককে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। তারা যেমন নিজেরা শিশুদের নির্যাতন করবে না, তেমনি অন্যের নির্যাতন থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে।

কাজ-১ : শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নমূলক আচরণের একটি তালিকা তৈরি কর।

নিপীড়ন	
শারীরিক	মানসিক

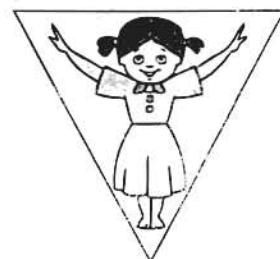
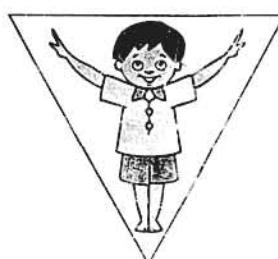
কাজ-২ : নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর সত্য হলে ‘স’ এবং মিথ্যা হলে ‘মি’ বোর্ডে লিখ।

১. একটি শিশু পরিবারের সকলের আদর, যত্ন ও ভালোবাসার মধ্যে বেড়ে উঠে।
২. ছেলেমেয়েরা বাড়িতে বা বাড়ির বাইরে কখনো নিপীড়নের শিকার হয় না।
৩. অনেক বাড়িতে ছেলেমেয়েদের বকুনি দেয়া ও মারপিট করা হয়।
৪. শিশুগুরু নিরোজিত শিশুরা ভালো পরিবেশে কাজ করে।
৫. নিপীড়িত শিশুরা আনন্দ-উল্লাসে মেটে থাকে।

পাঠ-২ : বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষার কৌশল

একটি শিশুর পরিপূর্ণ সুস্থিতার সাথে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠার জন্য তার বাল্য ও কৈশোর জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসময় তার যেমন পুষ্টির ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি দরকার একটি নিরাপদ পরিবেশের। যে পরিবেশে শিশু পরিবারের সকলের আদর-যত্ন, ভালোবাসার মাঝে নিজেকে নিরাপদ দেখতে পায় না, এমন পরিবারে শিশুরা নির্যাতনের শিকার হয়। যেমন কখনো কখনো শিশুরা পছন্দ না করলেও জ্ঞার করে চুম্ব খাওয়া, আদর করা, গায়ে হাত দেওয়া, কোলে বসানো বা কোলে নেওয়া ইত্যাদি। সুন্দর ও স্বাভাবিক আচরণ বা স্পর্শ শিশুরা বুঝতে পারে। যে স্পর্শ শিশু পছন্দ করে না তাই মন্দ স্পর্শ। মন্দ স্পর্শ শিশুর মানসিক বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। তাদের মনের কথা অভিভাবক বা বড়দের বলতে পারে না। অথবা বলার পর অভিভাবক যদি সে কথার গুরুত্ব না দেয় তাহলে শিশুদের বড় ধরনের ক্ষতি হয়। কাজেই আমাদের শিশুদের মনের কথা তাদের ভালোলাগা ও মন্দ লাগার কথা শুনতে হবে। ভালো ও মন্দ স্পর্শ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে এবং তাদের

বলতে হবে দুই দিকে হাত প্রসারিত কর
এবং পা থেকে দুই হাতের মাঝের আঙ্গুলের
সাথে কাঙ্গালিক রেখা টান। এই ত্রিভুজ গভীর
তোমাদের অপরের সাথে নিরাপদ দূরত্ব
চিহ্নিত করে। সমাজে শারীরিক, মানসিক ও
যৌন এই তিনি প্রকারে শিশুরা নির্ধারিত হয়।
অবুবা শিশুদের উপর এরূপ নির্ধারিত ভৱাবহ
প্রতিক্রিয়ার সূচী করে। তারা শারীরিকভাবে



আহত হয়, আতঙ্গিত্ব হয়ে পড়ে, হতাশায় ভোগে, তাদের মধ্যে প্রতিশোধস্থূল জাগে, সমাজবিরোধী
আচরণে অভ্যন্ত হয়ে উঠতে পারে, আহার ও শুধুর ব্যাধাত ঘটে এবং পরিণামে জ্বাল্যহানি হয়। শিশু
নির্ধারিতনের এই কুকুল সম্পর্কে শিশু-কিশোরদের ধারণা দেখার প্রয়োজন। বাড়িতে বাবা-মা, অভিভাবক বা
বড়ো এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ এ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারেন। এর পাশাপাশি এসব নির্ধারিতনের বিবুল্দে
কীভাবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষা করা যায়, তার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করে শিশু-কিশোরদের সচেতন
করা যায়। পরিবারের বাইরে কোনো শিশু নির্ধারিতনের শিকার হলে ঐ শিশু মা-বাবা অথবা পরিবারের বয়স্ক
সদস্যদেরকে তা জানাবে এবং তারা এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। নির্ধারিতনের শিকার শিশুটি
চুপ করে না থেকে প্রতিবাদ করবে। কেউ যদি বিবুল্দ মন্তব্য বা উপহাসমূলক কথা বলে, সামান্য বা বিনা
কারণে তিরস্কার করে, তাহলে প্রতিবাদ জানাবে এবং বলবে যে তারা ঠিক কাজ করছে না। কেউ যদি
অন্যায়ভাবে দোষাত্ত্বাপ করে তবে সে নিজেকে দোষী ভাববে না। সে মনে রাখবে যে সে কোনো অন্যায়
করেনি। ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, অল্প পরিচিত বা অপরিচিত কেউ যদি কোনো কিশোরীকে অন্যায়ভাবে তার
শরীর সম্পর্ক করে বা সম্পর্ক করার চেষ্টা করে, তাহলে বাড়িতে মা, খালা, বড় বোন বা অনুরূপ কাউকে জানিস্থি
দেবে। কোনো শিশুর ভয় বা সংজ্ঞা পাবে না। কারণ যে বা শারা এ কাজটি করেছে তারা অন্যায় করেছে।
কোনো কিশোরী একাকী কোথাও যাবে না। কেউ খারাপ কথা বললে কিংবা খারাপ প্রস্তাব করলে রাজি হবে
না। দুর্ঘটনাবশত কেউ নির্ধারিতনের শিকার হলে তার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট লাঘবের জন্য সেবা, চিকিৎসা
ও স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে তাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য সাহায্য করতে হবে। বাবা-মা,
অভিভাবকসহ শিক্ষক এবং পরিবারের অন্য সদস্যদেরও সচেতন হতে হবে, যাতে ছেলেমেয়েরা কোনো
নির্ধারিতনের শিকার না হয়।

কাজ-১ : নিচের বিষয়গুলোকে ভূমি কীভাবে দেখবে [টিক (✓) চিহ্ন দাও]

	একমত	একমত নয়
১. নির্ধারিতকারী ব্যক্তিকে কেউ ভালো বলে না		
২. নির্ধারিত শিশুকে সবাই ঘৃণা করে		
৩. নির্ধারিত শিশুর পাশে দাঁড়াতে হয়		
৪. নির্ধারিত শিশুকে উপহাস করা ঠিক নয়		
৫. নির্ধারিত শিশুকে স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে সুস্থ করে তোলা প্রয়োজন		
৬. নির্ধারিতনের বিষয়ে মা-বাবা বা বড়দের জানাতে হবে		
৭. নির্ধারিতকারী থেকে সতর্ক থাকা দরকার		
৮. নির্ধারিত শিশুকে সাহস ও শক্তি যোগাতে হবে		

কাজ-২ : তোমার কোনো বন্ধু নির্যাতনের শিকার হলে তার প্রতি সহানুভূতি জানাতে কী কী করা প্রয়োজন ?
তোমার কোনো সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে ৩টি উপায় লেখ।

- ১.
- ২.
- ৩.

পাঠ-৩ : বয়সসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন

নিরাপত্তাইনতার বিভিন্ন দিক : ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে যদি কোনো কাজ করতে বাধ্য করা হয় এবং বাধ্যতামূলকভাবে সে কাজ করতে গিয়ে যদি তা তার শারীরিক বা মানসিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তবে তাকে নিপীড়ন বলা যায়। যেকোনো বয়সের ছেলেমেয়ে, নারী-পুরুষকে প্রচঙ্গভাবে বকাবকি করা, উচ্চস্বরে ধমক দেওয়া, অগমান করা, শারীরিকভাবে আঘাত করা কিংবা মারধর করা- এসব কাজ নিপীড়নের আওতায় পড়ে। আমাদের সমাজে কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে বেশি নিপীড়নের শিকার হয়। শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাণী হলে তাকে শারীরিক নিপীড়ন বলে। যে সমস্ত কাজ, আচরণ, কথা প্রভৃতি শিশু-কিশোরকে মানসিক কষ্ট দেয় এবং শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশকে বাধাপ্রাণী করে, তাকে মানসিক নিপীড়ন বলে। যেমন: গৃহকর্মী হিসেবে একটি শিশুকে তার সাথের অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করা, তার পক্ষে সে কাজ করা সম্ভব না হলে তাকে বকুনি দেওয়া ছাড়াও শারীরিক নির্যাতন করা বা গৃহসমগ্রী দিয়ে আঘাত করা হয়। ফলে ঐ শিশুটি শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শারীরিক নিপীড়ন : শারীরিক নিপীড়ন আরেকটি বিষয় যা শিশুর বিকাশে বাঁধা সূচি করে। অসৎ উদ্দেশ্যে কারো শরীরের কোন অংশে বিশেষত পোশাকে ঢেকে রাখা অংশে হাত বা অন্য কোনো অঙ্গ দিয়ে স্পর্শ বা আঘাত করা হলে তাকে শারীরিক নিপীড়ন বলা হয়। শারীরিক নির্যাতনের শিকার একজন কিশোর-কিশোরীর পরবর্তীতে স্বাভাবিক জীবনে আসতে কষ্ট হয়। সে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নিগৃহীত হয়। এই নিপীড়নের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বাল্যবিবাহ। আমাদের দেশে অনেক ছেলেমেয়েরই কৈশোরে বিয়ে হয়ে যায়। অভিভাবকদের মধ্যে তাদের ছেলেমেয়েদের খুব কম বয়সে বিয়ে দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

অপরিণত বয়সে এরূপ বিয়ের ঘটনা ঘটলে তাকে বাল্য বিবাহ বলে। বাংলাদেশে বিবাহ নির্বস্থন আইন অনুসারে ২১ বছরের কম বয়সী একজন ছেলে এবং ১৮ বছরের কম বয়সী একজন মেয়ের বিয়ে আইনত নিষিদ্ধ। বয়সসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদেরকে শারীরিক, মানসিক ও বাল্যবিবাহের ক্রুফল থেকে নিরাপদ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আগামী দিনের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

কাজ-১ : ছোট গৃহকর্মী শিশুটির উপর নিপীড়নমূলক আচরণগুলো নিচের ছকে সাজাও-

শারীরিক নিপীড়ন	মানসিক নিপীড়ন
১. চড় মারা	১. বাপ-মায়ের নামে গালি দেয়া
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.

কাজ-২ : শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়। নিচে লেখা উপায়ের মধ্যে যেটা সঠিক তার ডানে টিক (✓) চিহ্ন দাও, আর তুল হলে ক্রস (✗) চিহ্ন বসাও।

১. নিজের কাজে মনোযোগী হওয়া।
২. কোনো সমস্যা দেখা দিলে মা-বাবা বা অভিভাবকের সাথে আলোচনা না করা।
৩. নিপীড়নের প্রতিবাদ করা।
৪. পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝে কাজ না করা।
৫. আত্মসচেতন হওয়া।
৬. অপরিগত বয়সে সন্তান ধারণ করলে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যহানি হওয়া।

কাজ-৩ : বাল্যবিবাহ কাকে বলে এবং বাল্যবিবাহের ফলে মা ও শিশুর কী ক্ষতি হয়- ধারাবাহিকভাবে লিখ।

পাঠ-৪ : বয়ঃসন্ধিকালে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার উপায়

বয়ঃসন্ধিকালে শিশু-কিশোরেরা শারীরিকভাবে দ্রুত বেড়ে ওঠে। এর সাথে সাথে তাদের মানসিক বিকাশ ঘটে। এ সময়ে তাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা খুব প্রয়োজন। সুতরাং স্বাস্থ্য যাতে আটুট থাকে, সেদিকে প্রত্যেকেরই লক্ষ রাখা উচিত। সুস্থিতাবে জীবনযাপন করতে হলে যেমন শরীরের যত্ন নিতে হয়, তেমনি স্বাস্থ্য বিধানসমূহ মেনে চলতে হয়। তাহলে আমাদের জানা প্রয়োজন, কীভাবে আমরা সুস্থ থাকব অর্থাৎ কীভাবে আমরা স্বাস্থ্য রক্ষা করব। শরীরের গঠন ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় রাখা এবং নীরোগ থাকাই হচ্ছে স্বাস্থ্যরক্ষা। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে।

দৈহিক স্বাস্থ্য : শিশুকাল থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত অর্থাৎ সাধারণত ২৫ বছর পর্যন্ত একজন মানুষের দেহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময়কালে এই দৈহিক বৃদ্ধি কখনো ধীরে, কখনো দ্রুত ঘটে। ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি স্থির থাকে। এরপর আর দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে না, বরং ক্ষয় হতে শুরু করে। কাজেই যেকোন বয়সের একজন ব্যক্তির শরীর সুস্থ রাখতে হলে তাকে বয়সোপযোগী সুষম খাদ্য গ্রহণের সাথে সাথে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। তাহলে সে তার দৈহিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে পারবে।

মানসিক স্বাস্থ্য : কোনো কারণে মানসিক অশান্তি থাকলে কাজে মন বসে না। দেহের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। আবার শরীর খারাপ থাকলে মন খারাপ হয়- চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিমত্তা কমে যায়। তাই দৈহিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার সাথে সাথে মানসিক স্বাস্থ্যও ঠিক রাখতে হবে। কারণ শরীর ও মনের সম্পর্ক নিপিড়, একে অপরের পরিপূরক।

দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার উপায় : স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে। এ জন্য প্রথমে স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আর তা হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা। স্বাস্থ্যবিষয়ক নিয়মকানুন বা স্বাস্থ্যবিধির মধ্যে রয়েছে সময়নির্বর্তিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, প্রয়োজনীয় ও পরিমিত ব্যায়াম, বিশ্রাম ও শুম, প্রয়োজনীয় পরিমাণে সুষম খাদ্য গ্রহণ, নিয়মিত খেলাধুলা, বিনোদন, সদা প্রফুল্ল থাকা, মাদকদ্রব্য বর্জন, আনন্দদায়ক বইপত্র পাঠ, সুস্থ বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন ইত্যাদি।

বয়ঃসন্ধিকালীন মানসিক চাপ সামলানোর কৌশলসমূহ : যে কোন ক্ষেত্রে তোমার মন খারাপ হবার কারণ চিহ্নিত কর যা তোমাকে মানসিক চাপ সামলাতে সাহায্য করবে। আয়নায় চোখ রেখে দৃঢ়তার ও অহঙ্কারইনভাবে বল ‘আমি সর্বোৎকৃষ্ট’। ভীত ও সংকীর্ত হয়েছ এমন কিছু নিয়ে বাবা-মা, ভাই-বোন,

শিক্ষক ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে সামনাসামনি ও খোলামেলা আলোচনা কর। যে কোন সমস্যার একাধিক বিকল্প সমাধান সম্পর্কে ভাবো এবং পরিস্থিতি ভেবে সমাধান পদ্ধতি প্রয়োগ কর। যে বিষয়টি ঘটবেই যা তোমার নিয়ন্ত্রণে নেই তা নিয়ে খুব বেশী ভাববে না। যা ঘটে গেছে তা তোমার জন্য ভালো বা খারাপ যাই-ই হোক না কেন তা মেনে নাও। যে কোন ঘটনাকে ব্যাপক ও অহৎ অর্থে বিবেচনা কর। নিজের অভ্যন্তরীন শক্তি মনের জোর ও দৈর্ঘ্যকে জাগিয়ে তোল এবং আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ আনো। ধরা ও ছোঁয়া যায় এমন বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দাও। কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে সমাধান করেছে এমন কাউকে অনুকরণ করার চেষ্টা কর। কঠিন বিষয়কে প্রথমে স্বল্প পরিমাণ শিখ এবং ধাপে ধাপে অধিক মাত্রায় জানার প্রতি আগ্রহী হও। যেকোন কাজে সফলতা আসবেই এমনটা ভাববে না। তুমি ব্যর্থও হতে পার, এটাও মনে রাখবে জীবনে সফলতা ও ব্যর্থতা পালাক্রমে আসে। পুরোনো পরিবেশের কি কি বিষয় নতুন পরিবেশের সাথে মিলে যায় তা নির্ণয় কর যা তোমাকে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করবে। বারবার চেষ্টা ও ভুল থেকে সঠিকটি তুমি একসময় শিখবেই।

কাজ-১ : শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ক কাজ, নিয়ম, বিধি ইত্যাদির সাহায্যে নিচের ছকটি পূরণ কর-

শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ক কাজ/বিধি	মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ক কাজ/বিধি
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

কাজ-২ : গত তিন মাসে তোমার বাড়িতে এবং স্কুলে বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে। এগুলোর মধ্যে যেসব ঘটনা তোমার মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছে, সেগুলো চিহ্নিত কর এবং প্রতিটির বর্ণনা লিখ।

ঘটনার উল্লেখ	ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

- বয়সসন্ধিকালে শিশু-কিশোরদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রয়োজন কেন?
 - শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য
 - পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণের জন্য
 - মেহ ও ভালোবাসার মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য
 - মা-বাবার কাজে সহযোগিতা করার জন্য
- বাংলাদেশে বিবাহ নিবন্ধন আইন অনুসারে কত বছর পর্যন্ত একটি মেয়ের বিয়ে আইনত নিষিদ্ধ?
 - ১৮
 - ২১
 - ২৫
 - ৪০
- বয়সসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের জন্য দরকার-
 - নিরাপত্তা
 - স্বাস্থ্যরক্ষা
 - আত্মসচেতনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মকানুন কোনটি?

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ক. টিফিন পিরিয়ডে খেলাধূলা করা | খ. যথাসময়ে ঘুমাতে যাওয়া |
| গ. সহপাঠীদের সাথে বিরামহীন ঘুরে বেড়ানো | ঘ. দৈনিক কয়েক ঘণ্টা ব্যায়াম করা |

৫. কত বছর পর্যন্ত মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে?

- ক. ১৮ খ. ২১ গ. ২৩ ঘ. ২৫

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৭ম শ্রেণির ছাত্রী 'X' একদিন মাদ্রাসা থেকে ফেরার পথে এক বখাটে ছেলে তাকে অঙ্গীতিকর মন্তব্য করলে সে তার প্রতিবাদ করে। বাড়িতে এসে তার বাবা মাকেও বিষয়টি অবহিত করে।

৬. ছাত্রী 'X' সম্পর্কে কোন কথাটি প্রযোজ্য?

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ক. সে শারীরিক নির্যাতনের শিকার | খ. সে ব্যক্তিগত নিরাপত্তাইন |
| গ. সে মানসিক নিপীড়নের শিকার | ঘ. সে যৌন নির্যাতনের শিকার |

৭. মা-বাবার সাথে আলোচনা করাটা 'X' এর কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| ক. সতর্কতামূলক মনোভাব | খ. ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কৌশল |
| গ. প্রতিশোধ স্পৃহা জাগা | ঘ. আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়া |

৮. বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কী করা উচিত?

- | | |
|--|---|
| ক. নিপীড়নের ঘটনা মা-বাবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা | খ. কোনোরূপ প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকা |
| গ. কেউ উপহাস করলে পাট্টা উপহাস করা | ঘ. নিরাপত্তার কৌশল সম্পর্কে সচেতন হওয়া |

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

কিশোরী রাজিয়ার বাবা মা ওর বিয়ের জন্য পাত্র ঠিক করেছিলেন। তাঁরা পাত্রপক্ষের চাহিদা মোতাবেক ঘোতুক দিতেও সম্মত ছিলেন। কিন্তু রাজিয়া সম্মতি না দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হতে পারেনি।

৯. রাজিয়ার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় বাধা ছিল-

- i. মা বাবার অসহযোগিতা ii. বাল্যকালে বিবাহ iii. পারিবারিক অসচ্ছলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

১০. রাজিয়া তার বিয়েতে রাজি না হওয়ার প্রধান কারণ কী?

- | | |
|---|----------------------------------|
| ক. তার তুলনায় পাত্র কম শিক্ষিত ছিল | খ. সে মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত ছিল |
| গ. বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন ছিল | ঘ. বাঙ্গবাদের পরামর্শ শুনেছিল |

পঞ্চম অধ্যায়

জীবনের জন্য খেলাধুলা

মানবজীবনের একটি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া হচ্ছে খেলাধুলা। একটি মানবশিশু খেলাধুলার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। খেলাধুলার জন্য কর্মক্ষম ও সুস্থ দেহ খুবই প্রয়োজন। আমাদের দেহ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত। সঠিক অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কর্মক্ষমতা, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বৃদ্ধি পায়। খেলাধুলার মাধ্যমেই এ কাজটি করা সম্ভব। শৈশবে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্রুত বেড়ে উঠে বলে অনেক সময় মাঝসপেশির সঙ্গে স্নায়ুর সমন্বয় ঘটে না। এই সমন্বয়হীনতা দূর করার জন্য ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা করা অপরিহার্য। সুস্থ, সবল, নীরোগ ও কর্মক্ষম শরীর গঠন অর্থাৎ সুন্দর জীবনের জন্য সবাইকে খেলাধুলায় সম্মত করা উচিত।



ফুটবল, ক্রিকেট, অ্যাথলেটিক্স, ভলিবল

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- ১। দেশি ও বিদেশি খেলার পার্থক্য বর্ণনা করতে পারব।
- ২। ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাড়ি, ভলিবল এবং অ্যাথলেটিক্সের নিয়মগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- ৩। চারটি খেলা (ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাড়ি, ভলিবল) এবং অ্যাথলেটিক্সের নিয়মগুলো মনে অনুশীলন করতে পারব।
- ৪। আগ্রহ অনুযায়ী কমপক্ষে একটি খেলায় বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ করে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারব।

পাঠ-১ দেশি ও বিদেশি খেলা

বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিতে বিভিন্ন খেলাধুলার প্রচলন রয়েছে। এসব খেলাকে দেশি খেলা নামে অভিহিত করা যায়। যেমন : দাঢ়িয়াবাঞ্চা, গোল্লাছুট, বৌছি, ডাঙ্গুলি, একাদোকা, হাড়ডু ইত্যাদি। এসব আঞ্চলিক খেলাধুলার বাইরে অন্যান্য খেলাধুলা যেমন: ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, বাস্কেটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি আন্তর্জাতিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এসব খেলার উৎপত্তি বাংলাদেশে হয়নি। তাই এগুলোকে বিদেশি খেলা বলে।

কাবাডি : কাবাডি এশিয়া মহাদেশের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশসমূহের জনপ্রিয় খেলা। বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশে এটি একটি প্রাচীন খেলা। এই উপমহাদেশে অঞ্চলিক বিভিন্ন নামে খেলাটি অনুষ্ঠিত হতো। যেহেতু আঞ্চলিক খেলা তাই বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন ছিল না। গ্রাম অঞ্চলে এই হা-ডু-ডু খেলাই ছিল বিনোদনের একমাত্র উৎস। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী হা-ডু-ডু খেলার পোশাকি নাম কাবাডি। বাংলাদেশ ও ভারতের অঙ্গুষ্ঠ প্রচেষ্টায় ১৯৮৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাফ গেমসে কাবাডি খেলা নিয়মিত ইভেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন থেকে কাবাডি খেলা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পা রাখে। ১৯৯০ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে কাবাডি খেলা অন্তর্ভুক্ত হলে এখেলা আন্তর্জাতিক মর্যাদায় উন্নীত হয়।

কাবাডি খেলার কোর্ট : মাঠ হবে সমান্তরাল ও নরম, মাটি অথবা ম্যাট দ্বারা তৈরি। কাবাডি খেলার মাঠ তিনি ধরনের-

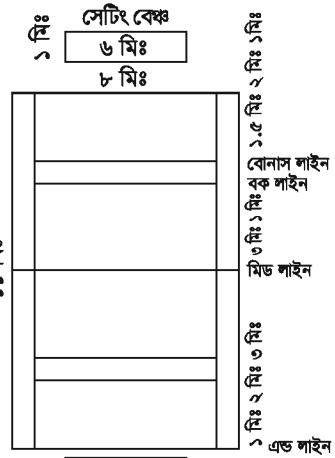
১. পুরুষ ও জুনিয়র বালক-১৩ × ১০ মিঃ
২. মহিলা ও জুনিয়র বালিকা-১২ × ৮ মিঃ
৩. সব জুনিয়র বালক ও বালিকা-১১ × ৮ মিঃ

সাব জুনিয়র কাবাডি সেটের বর্ণনা :

এই খেলায় প্রতিদলে মোট ১২ জন খেলোয়ার থাকে। ৭ জন মাঠ খেলোয়াড় ও ৫ জন অতিরিক্ত খেলোয়াড়। আমরা এখানে সব জুনিয়র বালক-বালিকাদের কোর্টের বর্ণনা দিব। যে সমস্ত বালক-বালিকাদের ওজন ৫০ কেজি বা তার নিচে এবং বয়স অনুর্ধ্ব ১৬ বছর তাদের জন্য কাবাডি কোর্টের পরিমাণ দৈর্ঘ্য ১১ মিটার ও প্রস্থ ৮ মিটার।

মিডলাইন থেকে বকলাইনের দূরত্ব ৩ মিটার। বকলাইন থেকে বোনাস লাইনের দূরত্ব ১ মিটার বোনাস লাইন থেকে এস্ট লাইনের দূরত্ব ১.৫ মিটার। কোর্ট থেকে সিটিং রুকের দূরত্ব ২ মিটার। সিটিং রুকের পরিমাপ হবে 1×6 মিটার কাবাডি কোর্টের প্রত্যেকটি দাগ ৫ সেঃ মিঃ চওড়া। সাব জুনিয়র খেলার স্থিতিকাল ১৫ মিঃ + ৫ মিঃ + ১৫ মিঃ = মোট ৩৫ মিনিট। দুই অর্ধের মধ্যে বিরতি কাল ৫ মিনিট। কোর্টের দুই পাশের ১ মিটার লম্বা জায়গাকে লবি বলে। ট্রাগল শুরু হলে লবি খেলার মাঠের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়। এক নিশ্চাসে এক নাগাড়ে কাবাডি কাবাডি বলাকে দম (cant) বলে। রেইডার দমসহ বিপক্ষ খেলোয়াড়ের যতজনকে ছাঁয়ে আসবে তার দল তত পয়েন্ট পাবে। তাকে ধরে রাখলে বিপক্ষ দল ১ পয়েন্ট পাবে। কোন দলের সমস্ত খেলোয়াড় মরা (out) হলে তাকে লোনা বলে। এজন্য বিপক্ষ দল অতিরিক্ত ২ পয়েন্ট পায়, যাকে লোনা বলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে দল বেশি পয়েন্ট পাবে সে দল জয়ী হবে।

কাজ-১ : কাবাডি খেলার জয় পরাজয় কিভাবে নির্ধারিত হয় তা ব্যাখ্যা কর।



সাব-জুনিয়র কাবাডি কোর্ট

অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালে লঙ্ঘন অলিম্পিকে প্রথম ফুটবল খেলা অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) গঠিত হয়। এটি বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ন্ত্রণকারী সর্বোচ্চ সংস্থা। ফুটবল বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় একটি খেলা। এই খেলার মাধ্যমে সহযোগিতার মনোভাব, আত্মবিশ্বাস, ক্ষিপ্ততা, নেতৃত্ব এবং নিয়মনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রভৃতি সৎগুণের বিকাশ ঘটে।

আইনকানুন :

১. খেলার মাঠ : আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার মাঠ দুই ধরনের পরিমাপে হয়। একটি হচ্ছে দৈর্ঘ্য ১১০ গজ ও প্রস্থ ৭০ গজ। অন্যটি দৈর্ঘ্য ১২০ গজ ও প্রস্থ ৮০ গজ। গোলপোস্ট উচ্চতায় ৮ ফুট এবং এক পোস্ট থেকে অন্য পোস্টের দূরত্ব ২৪ ফুট। উভয় গোলপোস্ট থেকে পাশে ৬ গজ এবং মাঠের দিকে ৬ গজ দূরত্ব নিয়ে যে আয়তক্ষেত্র তৈরি হয়, তাকে গোল এরিয়া বলে। উভয় গোলপোস্ট থেকে পাশে ১৮ গজ ও মাঠের দিকে ১৮ গজ দূরত্ব নিয়ে যে আয়তক্ষেত্র তৈরি হয়, তাকে পেনাল্টি এরিয়া বলে। দুই পোস্টের ঠিক মাঝখান থেকে মাঠের ভিতরে ১২ গজ সামনে একটি পেনাল্টি স্পট থাকে। প্রত্যেক পেনাল্টি শার্ককে কেন্দ্র করে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে একটি বৃত্তচাপ আঁকতে হবে। একে পেনাল্টি আর্ক বলে। মাঠের প্রতি কর্ণারে একটি করে ফ্ল্যাগপোস্ট স্থাপন করতে হবে। ফ্ল্যাগপোস্টের উচ্চতা কমপক্ষে ৫ ফুট হতে হবে এবং এর অঞ্চলগ চোখা হবে না। প্রতি কর্ণার ফ্ল্যাগপোস্টকে কেন্দ্র করে ১ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে মাঠের মধ্যে একটি বৃত্তাংশ আঁকতে হবে। উভয় গোলপোস্ট ক্রসবারের চওড়া ৫ ইঞ্চি এর বেশি হবে না। গোলপোস্ট এবং ক্রসবারের রং অবশ্যই সাদা হবে। মাঠের সকল দাগের চওড়া ৫ ইঞ্চি এর বেশি হবে না।
২. বল : বলের আবরন চামড়া বা ঐ জাতীয় কোন অনুমোদিত বস্তি দ্বারা তৈরি হবে। বলের আকার হবে গোলকার। বড়দের জন্য বলের পরিধি হবে ৬৮-৭০ সে.মি স্কুল প্রতিযোগিতার সময় পরিচালনা কমিটি ছোট পরিধি বল দিয়ে খেলতে পারে।
৩. খেলোয়াড় সংখ্যা : খেলা দুই দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় প্রতি দলে ১১ জনের বেশি খেলোয়াড় থাকবে না। ১১ জনের মধ্যে একজন গোলরক্ষক থাকবে। যদি কোনো দলে ৭ জনের কম খেলোয়াড় থাকে তবে খেলা আরম্ভ করা যাবে না।
৪. খেলোয়াড়ের সাজ-সরঞ্জাম : আন্তর্জাতিকভাবে জার্সি, হাফ প্যান্ট, মোজা, সিনগার্ড ও জুতা (ফুটওয়ার) ছাড়া খেলা যায় না। তবে আঞ্চলিকভাবে স্কুল পর্যায়ে এসব ছাড়াও খেলা হয়।
৫. রেফারি : খেলা পরিচালনার জন্য একজন রেফারি থাকবেন।
৬. সহকারী রেফারি : খেলায় দুজন সহকারী রেফারি নিযুক্ত হবেন। তারা আইন অনুযায়ী রেফারিকে খেলা পরিচালনায় সাহায্য করবেন। এছাড়া মাঠের বাইরে একজন চতুর্থ রেফারি থাকবেন।
৭. খেলার স্থিতিক্রম : খেলার নির্ধারিত সময় ৯০ মিনিট। প্রতি অর্ধে ৪৫ মিনিট করে বিভক্ত। মাঝে বিরাটি ১৫ মিনিটের বেশি হবে না। স্কুলের খেলোয়ারদের জন্য কর্তৃপক্ষ খেলার সময় কমাতে পারে।
৮. খেলা আরম্ভ : খেলার শুরুতে টসে জয়ী দলকে অবশ্যই মাঠের যেকোনো সাইড বেছে নিতে হবে। টসে পরাজিত দল রেফারির সংকেতের সাথে সাথে ‘কিক অফ’-এর মাধ্যমে খেলা শুরু করবে। এই কিক অফ খেলার শুরুতে, গোল হ্বার পর এবং হাফ টাইমের পর হয়ে থাকে। কিক অফ থেকে সরাসরি গোল হয়।

৯. বল খেলার মধ্যে ও বাইরে : বল যদি গড়িয়ে বা শূন্যে সম্পূর্ণ গোললাইন বা টাচ লাইন অতিক্রম করে, তবে সেই বলকে খেলার বাইরে ধরা হয়। রেফারি কর্তৃক খেলা বন্ধ হলে বল খেলার বাইরে গণ্য হয়।
১০. গোল হওয়া : গোল তখনই হয়, যখন বলের সম্পূর্ণ অংশ দুই পোস্টের ভিতর দিয়ে ও ক্রসবারের নিচ দিয়ে গড়িয়ে বা শূন্যে গোললাইন অতিক্রম করে।
১১. অফ সাইট : একজন খেলোয়াড় তখনই অফ সাইট হয়, যখন গোলকিপার ছাড়া বল ও বিপক্ষের অন্ততপক্ষে একজন খেলোয়াড় তার সামনে না থাকে।
১২. ফাউল ও অসদাচরণ : অপরাধ ও অসদাচরণের জন্য দুই ধরনের ফ্রি কিক দেয়া হয়। যথা- ডাইরেন্ট ও ইনডাইরেন্ট। নিম্নলিখিত ১০টি অপরাধের জন্য ডাইরেন্ট ফ্রি কিক দেয়া হয় -

 ১. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে লাঠি মারা বা লাঠি মারার চেষ্টা করা।
 ২. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ল্যাং মারা বা ল্যাং মারার চেষ্টা করা।
 ৩. বিপক্ষ খেলোয়াড়ের উপর লাফিয়ে পড়া।
 ৪. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আক্রমণ বা চার্জ করা।
 ৫. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আঘাত করা বা আঘাত করার চেষ্টা করা।
 ৬. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ধাক্কা দেয়া।
 ৭. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ট্যাকল করা।
 ৮. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আটকানো বা ধরে রাখা।
 ৯. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে খুখু দেয়া।
 ১০. ইচ্ছাকৃতভাবে হাত দিয়ে বল ধরা (স্বীয় পেনাল্টি এরিয়ায় গোলরক্ষকের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়)।

নিম্নলিখিত কারণে ইনডাইরেন্ট ফ্রি কিক দেয়া হয় -

 ১. গোলরক্ষক তার হাতে বল নিয়ন্ত্রণের পর খেলার মাঠে পাঠানোর পূর্বে যদি ৬ সেকেন্ডের বেশি সময় বল ধরে রাখে।
 ২. গোলরক্ষক একবার বল ছেড়ে দেয়ার পর অন্য কোনো খেলোয়াড়ের টাচ করার পূর্বেই যদি পুনরায় বলটি ধরে।
 ৩. স্বীয় দলের কোনো খেলোয়াড়ের ইচ্ছাকৃত কিক করা বল যদি গোলরক্ষক হাত দিয়ে টাচ করে বা ধরে।
 ৪. নিজ দলের কোনো খেলোয়াড় কর্তৃক থ্রো-ইন করা বল যদি গোলরক্ষক হাত দিয়ে টাচ করে বা ধরে।
 ৫. বিপজ্জনকভাবে খেলা।
 ৬. বল না খেলে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের সম্মুখগতিতে বাধা দেয়া।
 ৭. গোলরক্ষক বল ছুড়ে দেয়ার সময় তাকে বাধা দেয়া।

১৩. ফ্রি কিক : ফ্রি কিক দুই প্রকার। ক) ডাইরেন্ট ফ্রি কিক, খ) ইনডাইরেন্ট ফ্রি কিক। ডাইরেন্ট ফ্রি কিক থেকে সরাসরি গোল হয়। ইনডাইরেন্ট ফ্রি কিক থেকে সরাসরি গোল হয় না।
১৪. পেনাল্টি কিক : ডাইরেন্ট ফ্রি কিকের দশটি অপরাধের যেকোনো একটি পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে ডিফেন্ডার কর্তৃক ঘটলে বিপক্ষ দল পেনাল্টি কিক পায়। পেনাল্টি কিক মারার সময় শুধু গোলকিপার ও কিকার ছাড়া কেউ পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে থাকতে পারে না।
১৫. থ্রো-ইন : বল পার্শ্বরেখা অতিক্রম করলে থ্রো-ইন এর মাধ্যমে খেলা শুরু করতে হয়। থ্রো-ইন করার সময় বল দুই হাতে সমান ভর দিয়ে মাথার পেছন দিক থেকে এবং মাথার উপর দিয়ে দুই পা মাঠের বাইরে বা দাগের উপর রেখে বল মাঠের মধ্যে নিষ্কেপ করতে হয়। থ্রো-ইন থেকে সরাসরি গোল হয় না।

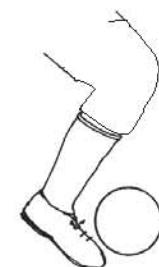
- ১৬. গোল কিক :** বিপক্ষের ছোঁয়া লেগে যদি বল গোললাইন অতিক্রম করে, তবে গোল কিক হয়। গোল কিক গোল এরিয়ার মধ্য থেকে করতে হয়। গোল কিক থেকে সরাসরি গোল হয়। তবে গোলকিক পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে না গেলে বল খেলার মধ্যে গণ্য হয় না।
- ১৭. কর্ণার কিক :** ডিফেন্ডারদের ছোঁয়া লেগে যদি বল গোললাইন অতিক্রম করে, তবে বিপক্ষ দল একটি কর্ণার কিক পায়। গোল পোস্টের যে পাশ দিয়ে বল গোললাইন অতিক্রম করে সেই পাশের কোনা থেকে কর্ণার কিক মারতে হয়।

কাজ-১ : পেনাল্টি কিকের কৌশলগুলো প্রদর্শন কর।

পাঠ-৩ : কলাকৌশল

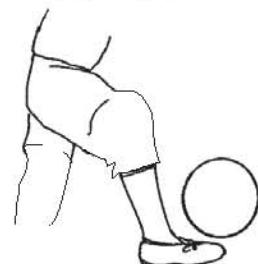
১. কিকিং :

ক. **লো হার্ড কিক বা জোরালো কিক -** জোরে নিচু দিয়ে কোনো বল অল্প দূরত্বে সোজাসুজি পাঠাতে হলে বলের দিকে সোজা আসতে হবে। পায়ের পাতার ভেতরের ওপর অংশ দিয়ে বলের যাবাখালে বা পেটে সঙ্গের লাধি মারতে হবে। যে পা দিয়ে কিক করবে, সে পায়ের ইঁটু এবং কোমর বলের ওপর ঝুকে থাকবে। অন্য পা বলের $\frac{7}{8}$ ইঞ্চি দূরে থায় সোজাসুজি অবস্থান করবে। এ কিককে ইনস্টেপ কিক বলে। বল উঁচু দিয়ে দূরে পাঠাতে হলে সোজা না এসে একটু কোনাকুনিভাবে দৌড়ে আসবে এবং বলের পেটের নিম্নভাগে আঘাত করবে। পায়ের পাতার অঞ্চলগ সম্পূর্ণ নিম্নমুখ না রেখে কিছুটা কোনাকুনিভাবে রাখবে।



লো হার্ড কিক

খ. **ভলি কিক :** ওপর দিয়ে বল দূরে পাঠাবার জন্য বল মাটিতে পড়ার পূর্বেই বা মাটিতে পড়ে কিছুটা ওপরে উঠলে যে কিক দেওয়া হয় তাকে ভলি কিক বলে।



ভলি কিক

গ. **হাফ ভলি কিক :** বল মাটিতে পড়ার পরক্ষণেই ওপরে উঠতে শুরু করার সাথে সাথে জোরে যে কিক করা হয়, তাকে হাফ ভলি কিক বলে। হাফ ভলি কিক খুব জোরালো হয়।



হাফ ভলি

ঘ. **চিপ শট :** অল্প দূরের সঙ্গীর কাছে উচু দিয়ে বল পাঠাবার পদ্ধতিকে চিপ শট বলে। যখন নিচু দিয়ে বা গড়িয়ে নিজ দলের খেলোয়াড়ের কাছে বল পাস করা সম্ভব হয় না অর্থাৎ বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় দ্বারা বল ধরে ফেলার সম্ভাবনা বেশি থাকে, তখন এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বা দু-এক পা দূর থেকে এসে পায়ের ভিতর অংশ দিয়ে বলের পেটের নিচের অংশে কিক করতে হবে।

২. ট্র্যাপিং বা বল আটকানো :

ক. **সোল ট্র্যাপিং (পায়ের পাতার তলদেশ দিয়ে বল ধারানো) :** পায়ের পাতার অঞ্চলগ ওপরের দিক করে সোড়ালি মাটি থেকে $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি ওপরে তুলে, অনেকটা ইংরেজি অঙ্গর ‘V’ এর মতো করে বল ধারানো।

- খ. পিল ট্র্যাপিং (হাতের নিচের অংশ দিয়ে বল ধারানো) : যাটিতে পক্ষা বল আউল করে ওপরে ঝঠার সাথে সাথে হাত ভাঙ্গ করে সামনের দিকে দিয়ে এবং পায়ের পাতা পিছনে রেখে হাতের নিচের অংশ দিয়ে বল ধারানো।
- গ. থাই ট্র্যাপিং (ভিত্তি সাহায্যে বল ধারানো) : থাই লস্তারে বা 75° থেকে 85° উঁচু দিয়ে আসা বল উন্নত উপর থের ধারাতে হবে। বল উন্নত স্থার করার সাথে বলসহ হাত নিচের দিকে নামিয়ে আনতে হবে।
- ঘ. হেড ট্র্যাপিং (মাথা দিয়ে বল ধারানো) : শম্ভু বা তির্যকজাবে আসা বল আঙ্গে করে যাহার লাগিয়ে বলের গতি কমিয়ে দিয়ে ঘন্টদূর সম্ভব বল নিজের কাছে যাটিতে ফেলা।
- ঙ. হেড়িং : বল হেড় করার সময় নিচের বিবরগুলোর প্রতি লক রাখতে হবে :
- দৃষ্টি বলের দিকে ধাকবে (চোখ কখনো বল ধাকবে না)।
 - যাহার সম্মুখ অংশে কণাল ও চুলের সম্মিশ্রণে বল লাগবে।
 - যাড় শক্ত রেখে বলে আঘাত করতে হবে।
 - যাহা ঘুরিয়ে বল পাঠানোর দিক পরিবর্তন করতে হবে।
 - পিছনের দিকে হেড় করার সময় যাহা সম্পূর্ণ পিছন দিকে দিয়ে কণাল দিয়ে হেড় করতে হবে।
১০. পোল রক্ষা (পোল কিপিং) : ফুটবল খেলার পোল কিপিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পোলঅক্ষককে বেশির ভাগ সময় হাত দিয়ে বল ধরতে হয়। আবার সময় সময় পা দিয়েও বল আটকাতে বা মারতে হয়। তাই হাত ও পা দিয়ে যাহার ও ধরার কলাকৌশল অবশ্যই শিখে নিতে হবে।

বিভিন্নভাবে আসা বল ধরার পদ্ধতি :



- ক. নিচু বল—সকল অবস্থায় বলের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। নিচু বল ধরার জন্য সম্পূর্ণ দেহ ঠিক বলের পিছনে আধবে এবং হাতে সোজা রেখে শরীর সামনে বুকে দুঃহাত দিয়ে বল কুড়িয়ে নিয়ে বুকের কাছে নিয়ে নেবে।

৬. কোমর সমান বল— কোমর সমান বলকে বলের সাইনে দাঢ়িয়ে ধরতে হবে। বল ধরার সঙ্গে সঙ্গেই তলপেটাকে তিক্তজ্ঞ দিকে নিয়ে বলটাকে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিবেই দুই হাত দিয়ে বল শক্ত করে অঙ্গিয়ে ধরতে হবে যেন বলটা ছিটকে না পাচ্ছে।



কোমর সমান বল ধরা

৭. উচু বল— উচু বল ধরার জন্য দুই হাত সামনে বা উপরে বাড়িয়ে দুই হাতের তালু বা আঙুলের সাহায্যে বল ধরে বুকের কাছে টেনে আনতে হবে।



উচু বল ধরা

৮. কল কাঙ্কাঙ্কি করা (কল ট্যাকলিং) : ফুটবল খেলার ট্যাকলিং একটা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাত্মক কৌশল। সামনে, পিছনে ও পাশ দিকে ট্যাকলিং করা বায়। ট্যাকলিংয়ের সময় চোখ অবসাই বলের উপর রাখতে হবে। বিশেষ মধ্যে তার ভাস্তুসাম্য রক্ষা করতে অস্বিধাবোধ করে ঠিক সে মুহূর্তেই ট্যাকলিং করা সোজা ও স্ববিধাজনক। ট্যাকলিংয়ের সময় যাতে বিপক্ষের চার্জ না হয়, সেদিকে লক রাখতে হবে।

কাজ-১ : ফুটবল খেলার কলাকৌশল ব্যাখ্যা কর এবং বিজ্ঞ সঙ্গে বিকল্প হয়ে আঠে প্রদর্শন কর।

পাঠ-৪ : ক্রিকেট

ক্রিকেট খেলার জন্ম ইংল্যান্ডে। ক্রিকেট একটি জনপ্রিয় খেলা। ক্রিজ বা ক্রিগ শব্দ থেকে ক্রিকেট শব্দটির উৎপত্তি হয়। ক্রিজ শব্দের অর্থ বক্র/বন্ড এবং ক্রিগ শব্দের অর্থ গাছের গুড়ি। উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস অজানা থাকলেও ধারণা করা হয় যে, রাখাল বালকের দল মেষ, গরু চড়াতে গিয়ে অবসর সময়ে ক্রিগ গাছের কাটা গোড়াতে নিশানা করত পাথর, শক্ত মাটির দলা কিংবা কোন গাছের ফল দিয়ে। পরবর্তীতে কোন রাখাল বালক তার ছড়ি দিয়ে পাথর, শক্ত মাটির দলা কিংবা কোন গাছের ফল ঠেকাতে চেষ্টা করে। এভাবে ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন এসে ক্রিকেট খেলা বর্তমান রূপ লাভ করে। ক্রিকেট খেলার ৪২ টি আইন কানুন আছে। সংক্ষিপ্ত ভাবে এই আইন কানুন জানা দরকার।

আইনকানুন :

১. খেলোয়াড়-দেশে ১৪ জন এবং বিদেশে ১৫ জন খেলোয়াড় সমন্বয়ে একটি দল গঠিত হয়। একজন অধিনায়কের নেতৃত্বে ১১ জন করে দুই দলে বিভক্ত হয়ে খেলা হয়।
২. পরিবর্তন- কোনো খেলোয়াড় খেলার সময়কালীন অসুস্থ বা আহত হয়ে পড়লে আম্পায়ারের অনুমতি সাপেক্ষে তার পরিবর্তে একজন খেলোয়াড় ফিল্ডিং করানো যাবে। কিন্তু ব্যাটিং, বোলিং ও উইকেট কিপিং করানো যাবে না।
৩. আম্পায়ার- মাঠে খেলা পরিচালনার জন্য ২ জন আম্পায়ার, ১ জন রিজার্ভ আম্পায়ার এবং ১ জন টিভি আম্পায়ার থাকে। মাঠে আম্পায়ারদ্বয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।
৪. স্কোরার- যত রান হবে তা রেকর্ড করার উদ্দেশ্যে স্কোরার নিযুক্ত হবেন এবং আম্পায়ার দ্বয়ের নির্দেশ ও সংকেত প্রাপ্তি স্থাকার করবেন।
৫. বল- বলের ওজন ও আকার আম্পায়ার ও দুই দলের অধিনায়ক দ্বারা খেলার পূর্বেই অনুমোদন নিতে হবে। খেলার পুরো সময় বল আম্পায়ারদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।
৬. ব্যাট- ব্যাটের দৈর্ঘ্য ৩৮ ইঞ্চি ও প্রস্থ $4 \frac{1}{8}$ ইঞ্চির বেশি হবে না।
৭. পিচ- পিচের দৈর্ঘ্য ২২ গজ ও প্রস্থ ১০ ফুট।
৮. উইকেট- প্রতি প্রাপ্তে বেলসহ তিনটি করে উইকেট সোতো থাকবে। মাটি থেকে বেলসহ উইকেটের উচ্চতা $28 \frac{1}{2}$ ইঞ্চি।
৯. বোলিং এবং পিপিং ক্রিজ- উইকেটের সাথে একই রেখায় বোলিং ক্রিজ হবে যার দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি। বোলিং ক্রিজের সামনে ৪ ফুট সমান্তরালভাবে টানা হবে পিপিং ক্রিজ।
১০. পিচের তস্বাবধান- প্রতি ইনিংসের শুরুতে অধিনায়কের অনুরোধে সর্বোচ্চ ৭ মিনিট করে রোল নিতে পারবে। নিচের ঘাস খেলা শুরুর ৩০ মিনিট আগে ছাঁটা হবে।

- ১১. ইনিংস-** প্রতি দল ৫ দিনের খেলায় ২টি করে এবং এক দিনের খেলায় একটি করে ইনিংস পর্যায়ক্রমে খেলবে। ইনিংসের নির্বাচন টস দ্বারা নির্ধারিত হবে।
- ১২. ফলো অন-** পাঁচ দিনের খেলায় যে দল প্রথমে ব্যাট করে ২০০ রানে, তিন বা চার দিনের খেলায় ১৫০ রানে, দুই দিনের খেলায় ১০০ রানে এবং ১ দিনের খেলায় ৭৫ রানে এগিয়ে থাকলে প্রতিপক্ষ দলকে ফলো-অন করাতে পারবে।
- ১৩. ডিক্লারেশন-** ১ দিনের (সীমিত ওভার) ম্যাচ ছাড়া টেস্ট অথবা যে কোন দিনের ম্যাচে ব্যাটিং দলের অধিনায়ক খেলা চলার মধ্যে যেকোনো সময় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারবে।
- ১৪. খেলা শুরু-** প্রতি ইনিংসের এবং প্রতি দিনের খেলার শুরুতে এবং যেকোনো বিরতির শেষে বোলার প্রান্তের আম্পায়ার ‘পে’ ডেকে খেলা শুরু করবেন।
- ১৫. বিরতি-** মধ্যহস্তোজ ৪০ মিনিট, চা বিরতি ২০ মিনিট পানি পান বিরতির ৫ মিনিট (আলাদাভাবে সময় থাকে না) এবং দুই ইনিংসের মাঝে ১০ মিনিট।
- ১৬. খেলা সমাপ্তি-** প্রতিদিনের খেলার শেষে এবং খেলার সমাপ্তিতে আম্পায়ার ‘টাইম’ ডাকবেন, সেই সাথে উভয় উইকেট থেকে ‘বেল’ গুলো উঠিয়ে নেবেন।
- ১৭. স্কোরিং-** ‘রান’ এর দ্বারা স্কোরের হিসাব করা হবে।
- ১৮. বাটভারি-** দুই দলের অধিনায়কের সাথে বাটভারির ব্যাপারে আম্পায়ারকে একমত হতে হবে। সর্বনিম্ন ৫৫ গজ থেকে সর্বোচ্চ ৯০ গজ পর্যন্ত বাটভারি সীমানা টানা হয়।
- ১৯. লস্ট বল-** বল যদি কার্যকরী ক্ষমতার মেয়াদ থাকাকালে খুঁজে পাওয়া না যায় তাহলে যে কোনো ফিল্ডম্যান ‘লস্ট বল’ ডাকতে পারেন। ‘লস্ট বল’ ডাকা হলে স্কোরে ৬ রান যোগ হবে। কিন্তু ‘লস্ট বল’ ডাকার আগে যদি ৬ রানের বেশি রান নেওয়া হয়ে থাকে তবে সবকটি রান স্কোরে যোগ করা হবে।
- ২০. ফলাফল-** যে দলের মোট রান বিপক্ষের মোট রানের চেয়ে বেশি হবে, সে দলই জয়ী হবে। যদি রান সংখ্যা সমান থাকে এবং অন্য কোনো শর্ত না থাকে তবে খেলাটি অমীমাংসিত বলে ধরা হবে।
- ২১. ওভার-** সাধারণত ৬টি বলে একটি ওভার ধরা হয়। বল গড়িয়ে সীমানার বাইরে গেলে ৪ রান ও উপর দিয়ে সীমানার বাইরে গেলে ৬ রান যোগ হয়।
- ২২. ডেডবল-** আম্পায়ারের মতে বল পাকাপোক্তভাবে উইকেট রক্ষক বা বোলারের হাতে জমা পড়লে কিংবা বাটভারি হলে অথবা বলটি কোনো ব্যাটসম্যান বা আম্পায়ারের পোশাকের মধ্যে আটকে গেলে বলটি ডেড বলে গণ্য হবে।
- ২৩. নো বল-** কোনো বলে ডেলিভারি পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে আম্পায়ার সম্মত না হলে তিনি ‘নো বল’ সংকেত দেবেন।
- ২৪. ওয়াইড বল-** বল যদি ব্যাটসম্যানের নাগালের বাইরে এবং মাথার উপর দিয়ে যায় তাহলে আম্পায়ার ওয়াইড সংকেত দেবেন।

- ২৫. বাই এবং লেগবাই-** বোলারের বৈধ বল ব্যাটসম্যানের কোথাও স্পর্শ ছাড়া অতিক্রম করে এবং এই সুযোগে সংগৃহীত হয় বাইরান এবং ব্যাটসম্যানের হাতে ধরা ব্যাট স্পর্শ বাদে পায়ে বা দেহের কোথায় স্পর্শ করে সংগৃহীত রানকে লেগবাই বলে।
- ২৬. আপিল-** ফিল্ডিং দল কর্তৃক কোনো কিছু আপিল না করা হলে আম্পায়ার কোনো ব্যাটসম্যানকে আউট বলে ঘোষণা করবেন না।
- ২৭. ব্যাটসম্যান-** আউট অব হিজ গ্রাউন্ড গণ্য হবে যদি তার হাতে ধরা ব্যাটটি বা তার দেহের কোনো অংশ পপিং ক্রিজ লাইনের ভিতর দিকের জমি স্পর্শ করে না থাকে।
- ২৮. বোল্ড আউট-** বোলারের বৈধ বলে ব্যাটসম্যান ‘বোল্ড’ আউট হবেন যদি বলটির আঘাতে উইকেটের ‘বেল’ পড়ে যায়।
- ২৯. টাইমড আউট (Timed Out)-** একজন ব্যাটসম্যান আউট হবার পর ৩ মিনিটের মধ্যে পরবর্তী ব্যাটসম্যান পিচের মধ্যে স্ট্যান্স পজিশনে না দাঢ়াতে পারলে ফিল্ডিং সাইডের আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে আম্পায়ার টাইমড আউট দিবেন।
- ৩০. ক্যাচ আউট-** বলটি ব্যাটে লেগে ভূমি স্পর্শ করার আগেই কোনো ফিল্ডসম্যান যদি লুফে নেয় এবং ‘ফিল্ডসম্যান’ যদি পুরোপুরি মাঠের ভিতরে থাকে তবে ব্যাটসম্যান ‘কট আউট’ হবে।
- ৩১. হিট উইকেট-** নো বল ছাড়া ব্যাটসম্যান খেলতে গিয়ে তার ব্যাট বা দেহের কোন অংশ দিয়ে উইকেট ভেঙ্গে গেলে আম্পায়ার হিট উইকেট আউট হবে।
- ৩২. এলবিডল্লিউ -** আম্পায়ার যদি মনে করেন যে লেগস্ট্যাম্পের বাইরের বল ছাড়া কোনো বল ব্যাটসম্যানের পায়ে বা শরীরে প্রতিহত না হলে সরাসরি স্ট্যাম্পে আঘাত করত, তবে তিনি ব্যাটসম্যানকে এলবিডল্লিউ হিসেবে আউট করে দিবেন।
- ৩৩. রান আউট-** বল খেলে রান নেওয়ার উদ্দেশ্যে উভয় ব্যাটসম্যান দৌড় শুরু করলে পপিং ক্রিজে পৌছার আগেই যদি বিপক্ষ দল কর্তৃক উইকেট ভেঙ্গে দেওয়া হয় তবে ব্যাটসম্যান আউট হবে।
- ৩৪. স্ট্যাম্পড আউট-** নো বল ব্যতিত ব্যাটসম্যান বল খেলতে গিয়ে যদি পপিং ক্রিজ থেকে বেরিয়ে যায়, সে সময় বিপক্ষ দলের উইকেট রক্ষক বিধিসম্মত ভাবে উইকেট ভেঙ্গে দেয় তখন ফিল্ডিং দলের আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে আম্পায়ার স্ট্যাম্পড আউট দিবেন।
- ৩৫. উইকেট রক্ষক-** উইকেট রক্ষক ফিল্ডিং দলের মধ্যমনি। বোলারের ডেলিভারি করা বল বিধিসম্মতভাবে উইকেটের পিছনে থেকে ধরবে।
- ৩৬. ফিল্ডসম্যান-** ফিল্ডার তার দেহের যে কোন অংশ দিয়ে বল থামাতে পারবে কিন্তু মাঝে রাখা অবস্থায় ফিল্ডারদের ব্যবহৃত যেকোন বস্তুতে বল লাগলে ব্যাটিং দল ফিল্ডিং দ্যা বলের জন্য ৫ রান পাবেন।

কাজ-১ : ক্রিকেট খেলার মাঠ অংকন করে অবস্থানগুলো উল্লেখ কর।

কাজ-২ : কী কী কারণে একজন ব্যাটসম্যান আউট হয় তা লিখে দেখাও।

পাঁচ-৫ : বলাকোশণ

ক্রিকেট খেলার মৌলিক কলাকোশণগুলোকে চারটি অধান ভাগে ভাগ করা যাব। বেমন : ক. ব্যাটিং, খ. বোলিং, গ. কিপিং, ঘ. উইকেট কিপিং।

ক. ব্যাটিং : ব্যাটিং শিখতে হলে শীপ স্ট্যান্ড, ব্যাকলিস্ট, এবং টাইমিং সময়ে পারদর্শ হতে হবে।

১. ব্যাটিং শীপ- শীপ দুই থকার

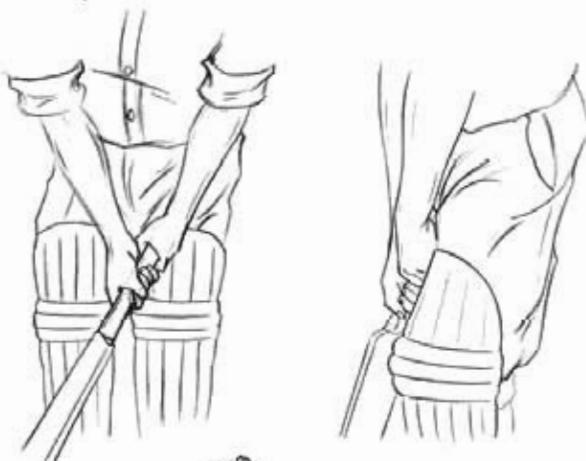
ক. O(ও) শীপ (O grip)

খ. V(ভি) শীপ (V grip)

ক। ও (O) শীপ- দুই ধরার সময় পোল হয়ে থাকে সেইজন্য সব দিকে সট খেলা থাকে না।

খ। V (ভি) শীপ- কুঠার ধরার অভ্যন্তরে ব্যাটের হাতল ধরতে হব। এই শীপ সবদিকে সট খেলার জন্য উপযোগী।

২. স্ট্যান্ড (Stance) : দুই পা পশিং কিপের দুই পাশে দিয়ে প্রয়োগ ব্যালেন্স অবস্থায় দাঁড়াতে হব। চোখের দৃষ্টি বলের দিকে ধাকবে। যায়/ভাল কাঁধ বোলারের দিকে ধাকবে।



ব্যাটিং

৩. ব্যাক লিফ্ট (Back Lift) : ব্যাটিংরের জন্য ব্যাকলিফ্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাকলিফ্ট করার সময় দৃষ্টি বলের দিকে কাঁধ ও কনুই বোলারের দিকে ধাকবে। হ্যাতের উপরের হাতের রিস্ট কক করলে ব্যাট অটোমেটিক্যালি উঠে আসবে।

৪. টাইমিং (Timing) – বল সিলেকসন করে ব্যাটিসম্যানকে টাইমিং করতে হব। এই টাইমিং করনো আঞ্চলিকান্যুলক আবার কখনো আক্রমণাত্মক হব।

আঞ্চলিকান্যুলক টাইমিং দুই ধরনের, ক) ফ্রন্টফুট ডিফেন্স (Front foot defence) খ) ব্যাকফুট ডিফেন্স (Back foot defence)

আক্রমণাত্মক টাইমিং দুই ধরনের

ক.ভার্টিক্যাল সট (Vertical short) (কান্তার ছাইত এবং স্টেট ছাইত)

খ.হরাইজেন্টাল সট (Horizontal short) (পুল মট, ফুক শট, স্যাইপ শট স্কোরার কাট ইত্যাদি)

শেছনে সরে দিয়ে যখন বলটিকে আঞ্চলিকান্যুলকভাবে খেলা হব, তখন তাকে ব্যাকওয়ার্ড ডিফেন্স নেটোক বলে। এ সময় ভাল পা শেছনে নিয়ে ব্যাটের হাতল সামনে এবং মাথা জেতের দিকে করে বল ধারাতে হব।

৫. ছাইত বা সজোরে আক্রমণাত্মক বল ধারা- যখন পশিং কিপের বেশ সামনে এক পা এলায়ে দিয়ে দূরে বল পাঠাবার জন্য সজোরে মাঝা হয় তখন তাকে ফ্রন্টওয়ার্ড ছাইত বলে।

৬. আবার কিউট শিছনে এসে যখন অনুরূপভাবে বল ধারতে হব, তখন তাকে ব্যাকওয়ার্ড ছাইত বলে।

কাহ-১ : ব্যাট ধরার কৌশলগুলো প্রদর্শন করে দেখো।

কাহ-২ : ব্যাট তোলা ও বল ধরার কৌশলগুলো প্রদর্শন কর।

পাঠ-৬ : বোলিং, ফিল্ডিং, ক্যাচিং, টাইকেট কিপিং

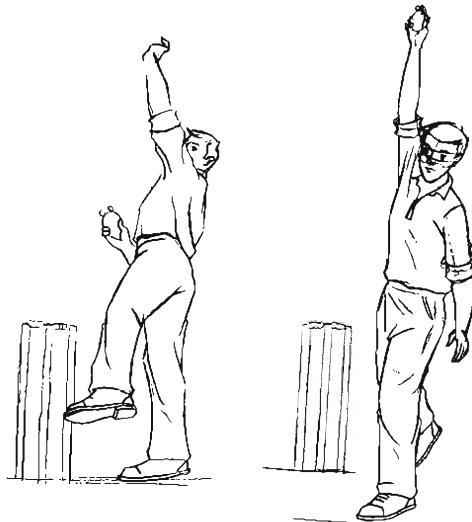
বল করার সময় অবশ্যই লক্ষ্যস্থল ও দূরত্বকে নিয়ন্ত্রণ করেই বল করতে হয়। সঠিকভাবে বল করার জন্য কতকগুলো মৌলিক কৌশল রঞ্চ করতে হয়। তাহলেই সহজে বল করতে পারা যায়। কৌশলগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো –

বোলিং :

১. বল ধরা – বোলিং করার সময় বলটাকে সব সময়েই হাতের আঙুলগুলোর মাঝে দিয়ে ধরতে হবে। বল কখনো হাতের তাশুতে রাখা যাবে না।

২. বল নিয়ে দৌড়ে আসা – কতটা দূর থেকে দৌড়ে এসে বল করা উচিত তা নির্ভর করবে কী রকমের বল করা হবে তার ওপর। বল নিয়ে দৌড়ানোর সময় শরীরের ভারসাম্যকে খানিকটা সামনের দিকে ও মাঝাটাকে স্থির রাখতে হবে।

৩. বল ছোড়া – বল হাত থেকে ছেড়ে বল ছোড়ার আগের মুহূর্তে বাম পায়ের



বোলিং

ওপর শাফ দিয়ে শরীরটাকে পাশের দিকে ঘূরিয়ে নিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান পা-কে সামনে নিয়ে যেতে হবে। ডান হাত মুখের কাছাকাছি এবং বাম হাতটা সোজা ওপরের দিকে এবং দৃষ্টি ব্যাটসম্যানের ওপর রাখতে হবে।

৪. বল ছোড়ার পদক্ষেপ – বল ছোড়ার পদক্ষেপ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনের পা-কে বোলিং ক্রিকেটের সমান্তরালে নিয়ে যেতে হবে। বাম কাঁধ ব্যাটসম্যানের দিকে থাকবে। দেহের পিছনটা খানিকটা বাঁকা থাকবে। বলসহ ডান হাত উচুতে থাকবে।

৫. অনুসরণ করা (ফলো প্রি) – ডান কাঁধ ব্যাটসম্যানের দিকে থাকবে। ডান হাত বাঁ পায়ের পাশ দিয়ে পেছনে নিয়ে যেতে হবে। বল ছোড়ার পর দৃষ্টি বলের দিকে থাকবে।

বিভিন্ন রকমের বোলিং –

বোলিং অনেক ধরনের করা যায়। নিচে কয়েক প্রকার সহজ বোলিংয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

১. ফাস্ট বোলিং – ফাস্ট বোলিং বা দ্রুত বল করার জন্য বোলারকে ১০ থেকে ১৫ খাপ বা তার বেশি দূরত্ব নিয়ে জোরে দৌড়ে আসতে হবে। কারণ দ্রুত বল করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। ফাস্ট বল গুড়লেখ্যে অর্ধেৎ পথিং ক্রিকেটের ১.২১ থেকে ১.২২ মিটার এর মধ্যে ফেলতে হয়।

২. **অফ ব্রেক-** এই বোলিং এ বলটাকে ‘ব্যাটসম্যানের’ ডান অর্থাৎ অফের দিকে ফেলে ভেতরের দিক ঘূরিয়ে দেওয়া হয়। বলটাকে ঘোরানোর জন্য আঙ্গুলগুলোর সাহায্যে মোচড় দিয়ে বল ফেলতে হবে। বল করার পর হাতের তালু উপরের দিকে থাকে।
৩. **লেগ ব্রেক-** এ সময় বলটাকে ব্যাটসম্যানের বা পায়ের দিকে ফেলে অফ স্ট্যাম্পের দিকে নিয়ে যেতে হয়। বল করার পর হাতের তালু নিচের দিকে যাবে। এ ছাড়া ইন সুইং, আউট সুইং, গুগলি, ইয়র্কার প্রভৃতি কায়দার বলা করা যায়। তোমরা উপরের ক্লাসে উঠে এগুলো শিখে নেবে।

ফিল্ডিং-

ফিল্ডিং বিভিন্নভাবে এবং মাঠের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে করা হয়। একে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. **রক্ষণাত্মক ফিল্ডিং-** ব্যাটসম্যানরা যেন দুই, তিন এবং চার রান না নিতে পারে সেইজন্য রক্ষণাত্মক ফিল্ডিং সাজানো হয়। এই সময় বল গড়িয়ে ফিল্ডারের কাছে যায় এবং ফিল্ডার বল ধরে উইকেট রক্ষকের নিকট ফেরত পাঠায়।

উঁচু দিয়ে আসা বল ধরার জন্য বলের গতির দিকে লক্ষ কর। দুই হাতের তালু খোলা রেখে হাত সামনে এগিয়ে দাও এবং বল ধরে টেনে বুকের কাছে নিয়ে এসো। তাহলে হাতে ব্যথা লাগবে না।

২. **আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং-** বল ধরার জন্য ফিল্ডার বলের দিকে দ্রুত যায় এবং দল ধরে উইকেট রক্ষকের কাছে ফেরত পাঠায়। এই ফেরত পাঠানোর কৌশল আবার তিন প্রকার : ১. আভার আর্মস্ট্রো ২. ভোভার আর্মস্ট্রো
৩. সোভার লেভেল থ্রো

ক্যাচ

ক্যাচ মিস তো ম্যাচ মিস। তাই ক্যাচ ধরা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বলের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখতে হবে। চোখের লাইনে হাত দুটো থাকবে এবং আঙ্গুলগুলো খোলা ও প্রসারিত থাকবে। কন্তুই দুটো পাশ থেকে সামনে আসবে। বল হাতে আসার সাথে সাথেই আঙ্গুলগুলো বন্ধ করে বুকের কাছে টেনে নিতে হবে। ক্যাচ কয়েক ধরণের হয়।

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| ১. স্লিপ ক্যাচ (Slip Catch) | ২. হাই ক্যাচ (High Catch) |
| ৩. গ্রাউন্ড ক্যাচ (Ground Catch) | ৪. ফ্ল্যাট ক্যাচ (Flat Catch)। |

উইকেট কিপিং-

উইকেট কিপার দলের মধ্যমনি। উইকেট কিপারের দক্ষতার উপর নির্ভর করে দলের জয়লাভ। সেই জন্য দক্ষ উইকেট কিপার হতে হলে এই সব কৌশলের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কিপিং এর গুরুত্বপূর্ণ ৪ বিষয় হলো-

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ১. ক্রাউচ (Crouch) | ২. গ্লোভওয়ার্ক (Glovework) |
| ৩. পজিশনিং (Positioning) | ৪. ফুটওয়ার্ক (Footwork) |

- ১. ক্রাউচ (Crouch) :** (গুটিশুটি মেরে থাকা) দুই পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসতে হবে। চোখ দুটি মাটির সমান্তরালে সামনের দিকে থাকবে। হাত দুটি দুই ইঁদুর মাঝখানে দিয়ে মাটি স্পর্শ করে জোড়া অবস্থায় থাকবে।

২. গ্লোভওয়ার্ক (Glovework) : Gloves (হাত মোজা) দুইহাতে গ্লাভস পড়া থাকবে। গ্লাভস সামনের দিকে খোলা অবস্থায় বোলার বরাবর থাকবে।

৩. অবস্থান (Position) : বলের ধরন দেখে উইকেট রক্ষক অবস্থান নিবে। যেমন, স্পিন বলের সময় উইকেটের নিকটে এবং ফাস্ট বলের সময় উইকেটের দূরে অবস্থান নিবে।

৪. পায়ের যাদু (Foot Work) : বল আসার অবস্থান বা দিক দেখে উইকেট কিপার তার পা ও শরীরের অবস্থান পরিবর্তন করে যদি বল ডান দিক দিয়ে আসে তাহলে ডান পা সরিয়ে বল ধরবে। অনুরূপভাবে বাম দিক দিকে আসলে বাম পা সরিয়ে বল ধরতে হবে।

কাজ - ১ : বোলিং এ্যাকশনের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে করে দেখাও।

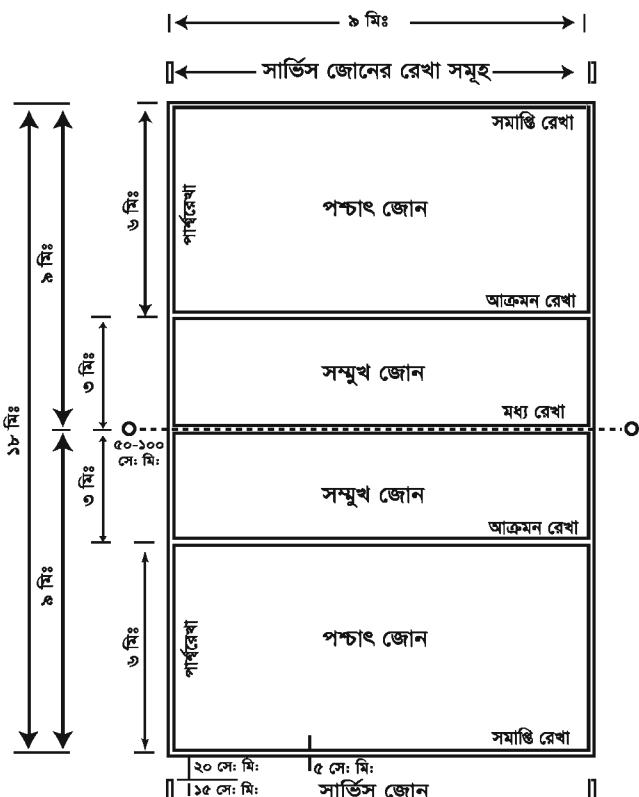
কাজ - ২ : উইকেট কিপারের অবস্থানগুলো মাঠে প্রদর্শন কর।

পাঠ-৭ ভলিবল

ভলিবল খেলার উৎপত্তি হয় আমেরিকায়। ১৮৯৫ সালে উইলিয়াম জি মর্গান এই খেলার প্রচলন করেন। প্রথমে ভলিবল খেলার নাম ছিল 'মিনটোনেট' এবং তখন এই খেলা হতো রাবারের বাড়ার দিয়ে। ১৯৪৭ সালে প্যারিসে ১৩ সদস্য দেশ নিয়ে 'ফিভ' বা আন্তর্জাতিক ভলিবল ফেডারেশন গঠিত হয়। বাংলাদেশও খেলাটি বহুল প্রচলিত। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন গঠিত হয়।

সাধারণ নিয়মাবলি :

১. ভলিবল খেলার কোর্টের দৈর্ঘ্য ১৮ মিটার ও প্রস্থ ৯ মিটার। কোর্টের সকল দাগের চওড়া ৫ সেন্টিমিটার। কোর্টের দুটি পার্শ্বের এবং দুটি প্রান্তরেখা থাকে এবং প্রত্যেকটি রেখাই কোর্টের অন্তর্ভুক্ত।
২. মধ্যরেখার সমান্তরাল করে উভয় পাশে ৩ মিটার দূরে দুটি রেখা টানা হয়। এটাকে আক্রমণ রেখা বলে।
৩. প্রান্তরেখার পেছনে ৯ মিটার এলাকাটাই সার্টিস অঞ্চল।
৪. মধ্যরেখার লাইন বরাবর পার্শ্ব রেখার ৫০ সে:মি: থেকে ১ মিটার দূরে দুপাশে ২.৫৫ মিটার উচ্চতায় দুটি গোলাকার ও মসৃণ দণ্ডের সাথে ১ মিটার চওড়া ৯.৫০ মিটার লম্বা জাল টানানো হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে জালের উচ্চতা হবে ২.৪৩ মিটার এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ২.২৪ মিটার।



ভলিবল খেলার কোর্ট

জালের দুইধারে পার্শ্বেরখার বরাবরে ১ মিটার লম্বা ও ৫ সে:মি: চওড়া দুটি ফিতা লাগানো থাকবে। ফিতার বাইরের পার্শ্ব দিয়ে খাড়ভাবে লাগানো ১.৮০ মিটার লম্বা ও ১০ মিলিমিটার চওড়া দুটি দণ্ড থাকবে। এই দুটি দণ্ডকে অ্যাণ্টিনা বলে। দণ্ড দুটি ৮০ সেন্টিমিটার জালের উপরে থাকবে। সম্পূর্ণ দণ্ড দুইটি পর্যায়ক্রমে সাদা ও লাল রঙের হবে।

৫. ১২ জন খেলোয়াড় নিয়ে একটি দল গঠিত হবে। মাঠে ৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে খেলতে হবে। প্রতি সেটে সর্বাধিক ৬ জন খেলোয়াড় বদল করা যাবে।
৬. খেলা আরম্ভের সময় সামনের সারিতে ৩ জন ও পেছনের সারিতে ৩ জন খেলোয়াড় দাঁড়াবে।
৭. টস বিজয়ী দল হয় সার্ভিস করবে বা কোর্ট পছন্দ করবে।
৮. সার্ভিস অঞ্চলে দাঁড়িয়ে বলকে শুন্যে তুলে আঘাত করে সার্ভিস করতে হয়। বলটাকে আঘাত করার পরই সার্ভার কোর্টে প্রবেশ করতে পারবে।
৯. রিসিভিং দল যখনই একটি সার্ভিস লাভ করবে, তখন ঐ দলের সকল খেলোয়াড় ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরে একবার তাদের অবস্থান পরিবর্তন করবে। এটাকে রোটেশন পদ্ধতি বলে।
১০. ভলিবল প্রতিযোগিতায় ৫টি সেটের মধ্যে যে দল ৩টি সেটে জয়লাভ করবে সে দলই বিজয়ী হবে।
১১. খেলা চলাকালীন বলকে বিপক্ষের কোর্টে পাঠানোর জন্য একদল সর্বাধিক তিনবার বলটিতে স্পর্শ বা আঘাত করতে পারবে। তবে ব্লকের সময় যদি কোনো স্পর্শ হয়, সেটাকে এই তিনবারের মধ্যে গণনা করা হবে না।
১২. একজন খেলোয়াড় পরপর দুইবার বলে স্পর্শ করতে পারবে না।
১৩. শরীরের যেকোনো অংশ দিয়ে বলে আঘাত করতে পারবে।
১৪. সার্ভিসের বল যদি নেট স্পর্শ করে বিপক্ষ কোর্টে যায় তাহলে সঠিক বলে ধরা হয়।
১৫. বিপক্ষ দলের কোর্টে বল থাকাকালীন নেটের উপর দিয়ে সেই বলকে আঘাত করা যাবে না।
১৬. পেছনের সারির খেলোয়াড়রা কখনই আক্রমণ করতে এসে জালের উপরের লাইনের উচ্চতায় বলকে ফেরত পাঠাতে পারবে না ও ব্লক করতে পারবে না।
১৭. যে দল ভুল করবে সে দল সার্ভিস হারাবে এবং অপর পক্ষ সার্ভিস ও একটি পয়েন্ট লাভ করবে।
১৮. যে দল আগে কমপক্ষে ২ পয়েন্টের ব্যবধানে ২৫ পয়েন্ট অর্জন করবে, সে দল সেট বিজয়ী হবে। যদি উভয় দলের পয়েন্ট ২৪-২৪ হয় তাহলে এক্ষেত্রে ডিউস হবে এবং ২ পয়েন্টের ব্যবধান না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলতে থাকবে। এভাবে প্রথম খেকে চতুর্থ সেট পর্যন্ত চলবে। পঞ্চম সেটে যে দল আগে ২ পয়েন্টের ব্যবধানে ১৫ পয়েন্ট অর্জন করবে, সে দল বিজয়ী হবে। আর যদি উভয় দলের পয়েন্ট ১৪-১৪ হয়, তাহলে ২ পয়েন্টের ব্যবধান না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলতে থাকবে।

ক্ষমাপ্তিশৈলি :

সার্টিস- সাধারণত সার্টিস দুইভাবে করা যাব।

১. কাঁধের নিচে হাত এবং সার্টিস করা
(আঙুল আর্ম সার্টিস)।

২. এক গা সামনে ও এক গা পেছনে
অথবা ভাল হাঁটু সামান্য তেজে পেছনের
পারে দেহের উজ্জ্বল রেখে দাঢ়াতে
হবে।

৩. সুবিধাজনক হাতের তালুতে বল নিয়ে
বিশ্রাম হাতকে সোজা অথবা পেছনের
সিকে নিয়ে থেকে হবে।



আঙুল আর্ম সার্টিস

৪. সুবিধাজনক হাতের কলকে উপরে সুন্দেয় ফুলে দিয়ে বিশ্রাম হাতের তালু কিংবা হাতের উপরিভাগ দিয়ে
বলে আঘাত করতে হবে।

৫. বলে আঘাত করার পর ফলো পুর করার জন্য অর্ধাং সামনে ঝুকে পড়ার কারণে শরীরের উজ্জ্বল সামনের
পারে নিয়ে থেকে হবে।

২. কাঁধের উপরে বল ফুলে সার্টিস করা (টেনিস সার্টিস) :

ক. সার্টিস অঞ্চলে গা দুটোকে আঢ়াআঢ়ি করে দুই পারের উপর শরীরের সমান উজ্জ্বল রেখে দাঢ়াতে হবে।

খ. ভাল হাতি খেলোয়াড়ের অন্য বী হাতের
তালুতে বল অথবা আয় ১ মিটার উচুতে
কলটাকে ছুঁড়ে দিতে হবে।

গ. কলটা নিচের দিকে নামার সময় ভাল হাতের
তালু দিয়ে কলটাকে সজোজে আঘাত করতে
হবে।

ঘ. পাস (Pass) করা- সাধারণত দুভাবে পাস
করা যায়-

১. সূচাত মালীর উপর নিয়ে পাস করা
(Upper hand pass) :

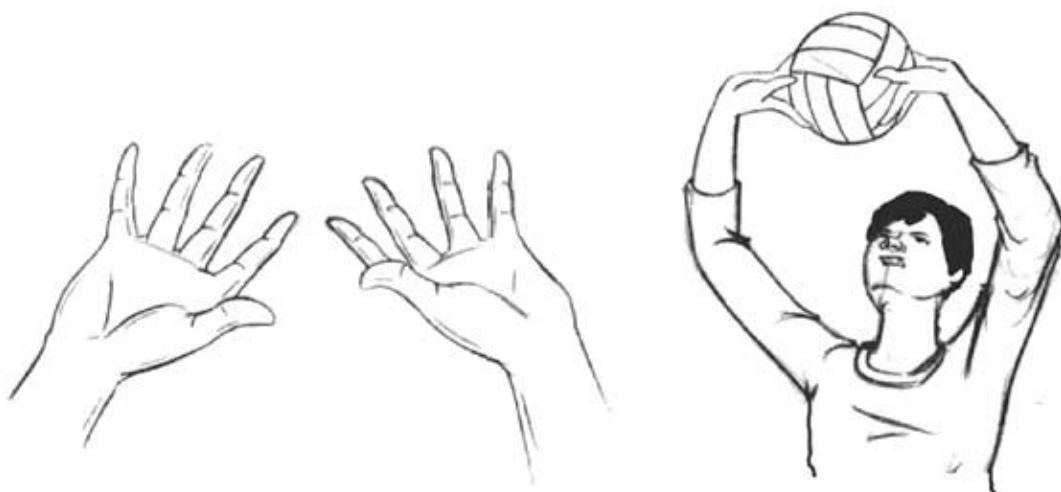
ক. বলটিকে সব সময় আঙুলের উপর গৌঁট ও
শেষ হাতের মাঝখানের অংশ দিয়ে স্পর্শ
করতে হবে।



টেনিস সার্টিস

খ. হাতের কনুই দুটো কাঁধ বরাবর রাখতে হবে, বাতে ঠিক কগালের সামনে থেকে খেলা যাব।

গ. হাঁটু দুটো তেজে দুশারের উপর সমান তর রেখে সামনের দিকে সামান্য ঝুকে দাঢ়াতে হবে।



আগুর হাত পাস

ঘ. বলের ঠিক পেছনে ও নিচের দিকে আবাড় করে সামনে খণ্ডের দিকে ঠেলে দিতে হবে এবং ইটু সোজা করে দোড়াতে হবে।

২. কনুই কাঁধের নিচে এসে পাস করা (Under arm pass) :

ক. বুঢ়ো আঙুল বাদে অন্য আঙুলগুলো দিয়ে দৃঢ়াতের আঙুলগুলোকে জড়িয়ে থার উপর বুঢ়ো আঙুল দুটোকে পাশাপাশি রাখতে হবে।

খ. কনুই দুটোকে ধমলভাবে রাখতে হবে, থাকে কনুই খেকে কজি পর্ণত হাতের অংশটা পাশাপাশি থাকে।

গ. দুই ইটু ভেও কোমর নিচু করে বলের নিচে শরীরকে নিয়ে যেতে হবে।

ঘ. কনুই এর কিছুটা সামনে খেকে কজি পর্ণত অংশ দিয়ে বলকে খণ্ডের উঠাতে হবে এবং শরীর সোজা করতে হবে।

কাজ-১ : আগুর আর্ব সার্টিস প্রদর্শন করে দেখাও।

কাজ-২ : টেনিস সার্টিসের কৌশলগুলো প্রদর্শন কর।

পাঠ-৮ : অ্যার্থলেটিক্স

খেলাধূলার ক্ষেত্রে সৌক্ষ, ঝাপ ও নিষ্কেপকে এক কথার অ্যার্থলেটিক্স বলা হব।

৪০০ ও ৮০০ মিটার সৌক্ষ : সাধারণত ৪০০ ও ৮০০ মিটার সৌক্ষকে যথ্যত দূরত্বের সৌক্ষ বলে। এ সৌক্ষের অন্য অংশের হয় ২০০ মিটার অধিকা ৪০০ মিটার অ্যার্থলেটিক ট্র্যাক। ট্র্যাকে লেনের সংখ্যা আটটি, তবে স্কুলে কমপক্ষে ছয়টি লেন থাকে। সর্ববামের লেনকে ১ নম্বর লেন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সৌক্ষের সময় শরীরের বায় পার্শ্বকে মাঠের তিতারের দিকে ঝেখে দোড়াতে হয়। এই সৌক্ষে স্ট্যাগার্ড ব্যবহার করতে হয়। সৌক্ষের দূরত্বে সময় আনার জন্য বে পছতি ব্যবহৃত হয় তাকে স্ট্যাগার্ড বলে। যনে রাখতে হবে, যথ্যত দূরত্বের সৌক্ষে শরীরের সম্পূর্ণ শক্তি একসাথে ব্যয় করতে হয় না। সৌক্ষের পিছিকে পোটা দূরত্বে তাগ করে

নিতে হয়। অর্ধেক বা তিন ভাগের একভাগ দূরত্বে সব শক্তি শেষ করে দিলে আর শেষ প্রাপ্তে যাওয়া যাবে না। সম্পূর্ণ দূরত্বে শক্তি বট্টন ক্ষমতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম ২০০ মিটার এবং দ্বিতীয় ২০০ মিটার দৌড়ানোর জন্য নেয়া সময়ের ব্যবধান ২ থেকে ৫ সেকেন্ডের বেশি হওয়া উচিত নয়। ছোট দূরত্বের দৌড় আরস্টের কায়দায় ৪০০ মিটার ও ৮০০ মিটার দৌড় আরস্ট করার পর আরস্ট সময়ের গতিবেগ সর্বোচ্চ গতিবেগের চেয়ে সামান্য কম হবে। শেষ চক্র দৌড়ানোর সময় ২ থেকে ৩ মিটারের বেশি ব্যবধান রাখবে না। মধ্যম দূরত্বের দৌড়ে পায়ের কদম ছোট দৌড়ের চেয়ে বড় হবে।

১০০ × ৪ মিটার রিলে দৌড় : এই রিলে বা যুক্তদৌড়ে প্রত্যেক দলে চারজন রানার থাকে। প্রত্যেককে ১০০ মিটার করে দৌড়ে সম্পূর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। এ দৌড়ের আরস্ট কৌশল স্পিন্টের অনুরূপ। তবে অতিরিক্ত কৌশল হচ্ছে –

- ক. দৌড়ের সময় ব্যাটন বা কাঠি বদল করার জন্য হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিতে হবে।
- খ. যাকে ব্যাটন দেবে তার বুড়ো আঙুলের দ্বারা তৈরি ‘ভি’ স্থানে কাঠিটি পৌছে দিতে হবে।
- গ. ব্যাটন হাতে স্পর্শ করার সাথে সাথে ধরে ফেলতে হবে এবং বাঁ হাতে নিয়ে যেতে হবে।
- ঘ. ব্যাটন দেয়া-নেয়ার সময় উভয়ের দৌড়ের গতি সমান থাকবে।

কাজ-১ : ৪০০ মিটার, ৮০০ মিটার এবং রিলে দৌড়ের আরস্ট ও সমাপ্ত করার কৌশল প্রদর্শন কর।

কাজ-২ : রিলে দৌড়ের কাঠি বদল কীভাবে করতে হয়, তা মাঠে প্রদর্শন কর।

পাঠ-৯ (ক) : দীর্ঘ লাফ

প্রস্তুতি- ওয়ার্ম আপ বা শরীর গরম ও বিশেষ কিছু ব্যায়ামের মাধ্যমে অ্যাথলেট শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেবে।

নিয়মাবলি :

- ক. লাফ দেবার জায়গা থেকে ১৬–২০ ধাপ দৌড়ে এসে সুবিধামতো বাম বা ডান পায়ের উপর ভর করে টেক অফ বোর্ডের উপর থেকে লাফ দিতে হবে।
- খ. টেক অফ বোর্ডের দৈর্ঘ্য ১.২১–১.২২ মিটার, প্রস্থ ২০ সে:মি: (২ মিলিমিটার কমবেশি হতে পারে), উচ্চতা ১০ সে:মি:। রং সাদা।
- গ. এ্যাপ্রোচ রানের দ্রুতগতি বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে সাহায্য করে।
- ঘ. উভয় পায়ের উপর একই সাথে অবতরণ করা।
- ঙ. মাটিতে অর্ধাং জাঞ্জিং পিটে অবতরণ করার সময় ইঁটু ‘দ’ এর মতো ভাঁজ করে থাকবে যাতে থুতনি ইঁটুতে না লাগে। মাথা সামনে ঝুঁকানো থাকবে।
- চ. জাঞ্জিং পিট- টেক অফ বোর্ড থেকে ল্যাঙ্কিং এরিয়ার শেষ প্রাপ্ত পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ১০ মিটার। টেক অফ বোর্ড থেকে ল্যাঙ্কিং এরিয়ার আরস্ট পর্যন্ত ১-৩ মিটার। প্রস্থ ২.৭৫-৩.০০ মিটার এবং গতীরতা ৩০ সেকেন্ডমিটার।

ক্ষাকৌশল : দীর্ঘ লাফের মধ্যে সাধারণভাবে চারটি অংশ রয়েছে। প্রথম টেক অফ নেবার জন্য দৌড়, দ্বিতীয় টেক অফ, তৃতীয় শুন্যে অবস্থান এবং শেষে জাঞ্চিং পিটে অবতরণ।

দৌড়ে আসা (অ্যাপ্রোচ রান)- টেক অফ নেওয়ার জন্য দৌড় ও নির্ভুল পদক্ষেপের উপর লাফের কৃতকার্যতা বিশেষভাবে নির্ভর করে। সাধ্যমতো অতি দ্রুততার সাথে দৌড়ে টেক অফ বোর্ডের কাছে আসতে হবে। আগে থেকে নিজের পদক্ষেপ ঠিক করে নিতে হবে।

মাটি থেকে উপরে উঠা (টেক অফ)- মাটি থেকে উপরে উঠার জন্য টেক অফ বোর্ডকে পায়ের পাতার সাহায্যে (যে পা দিয়ে মাটি ছাঢ়া হবে) সজোরে ধাক্কা দিয়ে উপরে উঠতে হবে। ধাক্কা দেয়ার সময় ইঁটুর সন্ধি সামান্য ভাঙ্গা থাকবে। তারপর পা সম্পূর্ণ সোজা করে নিতে হবে এবং একই সাথে বিপরীত ইঁটু ভেঙে দুলিয়ে সামনে পূর্বে নেয়া পায়ের সমান করতে হবে।

শুন্যে অবস্থান (ফ্লাইট)- দেহ উপরে উঠাবার জন্য ইঁটু টাক করা ('দ' এর মতো), ঝাঁকুনি দিয়ে খুব জোরে পা ছোড়া (হিচ কিক), কোমর দুলিয়ে ও হাত জোরে সামনে দুলিয়ে জাঞ্চিং পিটে অবতরণ করতে হবে।

অবতরণ (ল্যান্ডিং)- পা জাঞ্চিং পিটে পড়ামাত্র শরীর সামনে ঝাঁকুনি দিয়ে গড়িয়ে সামনে চলে আসতে হবে।

৯ (খ) গোলক নিক্ষেপ : গোলক নিক্ষেপকে ইঁরেজিতে শটপুট বলে। প্রাচীনকালে পাথর নিক্ষেপের প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে এটা লোহগোলক নিক্ষেপে পরিণত হয়েছে।

নিয়মাবলি :

ক. গোলকের ওজন পুরুষের জন্য ৭.২৬ কেজি এবং মহিলাদের জন্য ৪ কেজি। ব্যাস যথাক্রমে ১১-১৩ সেন্টিমিটার ও ৯.৫-১১ সেন্টিমিটার।

খ. গোলক নিক্ষেপের বৃত্তের ব্যাস ২.১৩৫ মিটার। বৃত্তের মাঝ বরাবর বর্ধিত দাগ ৭৫ সেন্টিমিটার।

গ. শটপুটের ল্যান্ডিং অ্যাজেল ৩৪.৯২ ডিগ্রি।

ঘ. বৃত্তের ভিতর থেকে ৩৪.৯২° সেকটরের মধ্যে নিক্ষেপ করে গোলকটি ফেলতে হবে।

ঙ. প্রত্যেকে তিনটি করে নিক্ষেপের সুযোগ পাবে।

নিক্ষেপের কৌশল : শেখার সুবিধার জন্য কৌশলগুলো নিচে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো :

১। গোলক ধরা :

(ক) গোলক হাতের তালু দিয়ে না ধরে আঙ্গুলের গোড়াসহ সম্পূর্ণ দিয়ে ধরতে হবে।

(খ) বুড়ো ও কড়ে আঙ্গুল দিয়ে বলের দুই পাশ ধরে রাখতে হবে, যাতে গড়িয়ে না পড়ে।

২। গোলক কাঁধের উপর রাখা :

(ক) গোলকটি গলা ও কাঁধের মিলনস্থলে ঝাঁজের মধ্যে ঠেলে রাখতে হবে, যাতে গোলকের ভার রাখা যায়।

(খ) ডান হাতের কনুই ডান পাশে খানিকটা উঁচুতে রাখতে হবে।

৩। প্রারম্ভিক অবস্থান :

(ক) যেদিকে গোলক ছুড়বে তার বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে।

(খ) ডান পা সামনে বা বাম পায়ের পাতাকে পিছনে নিয়ে ডান পায়ের গোড়ালির কাছে রাখতে হবে।

৪। স্থান পরিবর্তন :

- (ক) কোমর থেকে উপরের শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দ্রুত বাম পা-কে পিছনে উপরের দিকে দুলিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
- (খ) ডান পায়ের গোড়ালি দিয়ে সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে সম্পূর্ণ শরীরটা পিছনের দিকে ঠেলে নিতে হবে।
- (গ) এই অবস্থায় লাফানো উচিত নয়।

৫। নিষ্কেপের অবস্থান :

- (ক) বাম পায়ের ইঁটু না ভেঙে সোজা করে থামের (খুঁটির) মতো রাখতে হবে।
- (খ) ডান পায়ের ইঁটু ভেঙে কোমর থেকে উপরের শরীরটাকে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে।
- (গ) দৃষ্টি পিছনের দিকে রাখবে।

৬। গোলককে ঠেলে দেওয়ার ভঙ্গী :

- (ক) গোলক শূন্যে ঠেলে দেওয়ার সময় ডান হাতের কনুই কখনো নিচের দিকে নামাবে না।
- (খ) গোলকটি আঙ্গুল দিয়ে বাইরের দিকে প্রবল শক্তিতে ঠেলে দিতে হবে।

৭। গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ :

- (ক) গোলক নিষ্কেপের পর সামনের দিকে ঝুঁকে যাওয়া শরীরের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পিছনের ডান পা কে সামনে নিয়ে ইঁটু ভেঙে দেহটাকে একটু নামিয়ে তারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

কাজ-১ : গোলক ছোড়ার কৌশলগুলো মাঠে প্রদর্শন কর।

পাঠ-১০ উচ্চ লাফ

উচ্চ লাফকে ইংরেজিতে হাইজাম্প বলে। উচ্চ লাফ দেয়ার ল্যান্ডিং এরিয়ার দৈর্ঘ্য ৫ মিটার, প্রস্থ ৩ মিটার এবং উচ্চতা ৬০ সেন্টিমিটার। ক্রসবারের দৈর্ঘ্য ৪ মিটার, ওজন ২ কেজি এবং ব্যাস ২৯-৩১ মিলিমিটার। বিভিন্ন পদ্ধতিতে উচ্চ লাফ দেয়া যায়। যেমন :

ক. সিজার কাট, খ. বেলি রোল, গ. ফসবেরি ফ্লপ

ক. সিজারকাট :

১. দৌড়ে আসা (অ্যাপ্রোচ রান)- 30° - 45° ডিগ্রি কোণ করে বাবের দিকে দৌড়ে আসবে। ৮ বা ৯টি বড় বড় পদক্ষেপ নেবে। শেষের ২ বা ৩টি পদক্ষেপ দ্রুত হবে।
২. মাটি ছেড়ে উঠা- (টেক অফ) যে পায়ে ভর করে উপরে উঠবে অর্থাৎ টেক অফ ফুট ক্রসবার থেকে এক ফুট দূরে রাখবে। বিপরীত পা সঙ্গেরে উপরে কিক করবে।
৩. ক্রসবার অতিক্রম করা-(ক্রসবার ক্লিয়ারেন্স)-কিক করা পা ইঁটু ভেঙে ক্রসবারের উপর আনার সাথে সাথে টেক অফ ফুটও একইভাবে আনতে হবে। ক্রসবারের ঠিক উপরে শরীরকে বসার মতো ভঙ্গিতে রাখতে হবে।
৪. মাটিতে নামা (ল্যান্ডিং)-দুই পায়েই অবতরণ করবে। তবে টেক অফ নেয়া পায়ের বিপরীত পা আগে জ্যাম্পিং পিট স্পর্শ করবে।

৪. বেলিওল :

১. সৌত্ত্র আসা (অ্যাথোচ রান)- 45° কোণ করে ক্লসবারের দিকে সৌত্ত্র আসবে। সৌত্ত্র আসার অন্য ৭ বা ৮টি বড় বড় পদক্ষেপ নিবে। শেষের তিনটি পদক্ষেপ মুক্ত হবে।
২. মাটি হেঢ়ে উঠা (টেক অফ)- যে পায়ে তর করে উপরে উঠবে অর্ধাং টেক অফ কুট ক্লসবার থেকে এক কুট দূরে বেলাতে হবে। অন্য পা সঙ্গের উপরে কিক করবে।
৩. ক্লসবার অভিজ্ঞম করা (ক্লসবার ক্লিয়ারেল)- কোমর ক্লসবারের উপরে উঠলে শরীর দোরাতে হবে। দোরাবাল সময় পেট ক্লসবারের খুবই কাছে থাকবে। এ সময় শরীর উপুত্ত অক্রূয় ক্লসবারের সমাজরালে থাকবে।
৪. মাটিতে নামা (শ্যাডিথ)- যে পায়ে টেক অফ নেবে, তার বিপরীত পা এক দুই হাতের উপর তর করে অবস্থান করবে।

৫. ফসবেরি ঝপ :

১৯৬৮ সালে মেজিকো অলিম্পিকে আমেরিকার ডিক ফসবেরি এক নতুন পদক্ষিতে উচু লাক দিয়ে সোনার মেজেল পান এবং তখন থেকেই তার নাম অনুসারে ফসবেরি ঝপের প্রচলন। এই পদক্ষিতে বিশেষত্ব হলো, যে পা ক্লসবার থেকে দূরে থাকে, সে পা দিয়ে মাটি হেঢ়ে উঠের পথে খোঁ হয় এবং ক্লসবারের উপর দেহটা ক্লসবারের সমাজরাল থাকে ও পিঁটো ক্লসবারের কাছাকাছি থাকে। এই পদক্ষিতে সব থেকে সুবিধা হলো যে শরীরের তরকেন্দু অধি থেকে খুব অল ফুলেই ক্লসবারকে অন্যায়ে ডিলিয়ে বাঁওয়া যাব। বেহেন্ত পিঁটের উপর তর করে নামতে হয়, সেজন্য নিজের নিরাপত্তার কথা সবার আগে চিন্তা করতে হবে। তাই কোমের মাটি ছাড়া কখনই এই লাক অনুশীলন করা উচিত নয়।

১. সৌত্ত্র আসা (অ্যাথোচ রান)- ক্লসবারের সাথে 10° কোণ করে দাঁড়িয়ে সৌত্ত্র আসতে হয়। শেষের দুটি পদক্ষেপে দেহের তরকেন্দুকে একটু নাখিয়ে নিতে হয়।
২. মাটি হেঢ়ে উঠা (টেক অফ)- মধ্য শরীরটাকে খালিকাটা পিছন দিকে বুকিয়ে দিয়ে যে পা দিয়ে মাটি ছাড়া হবে, সে পা-টাকে দেহের তরকেন্দুর সাথলে রাখতে হবে। যখনই তরকেন্দুটি টেক অফ নেওয়া পায়ের উপর আসবে, তখনই সেই পা-টাকে ইটু সম্পর্কে তেকে নিয়ে দৃঢ় ও জোরের সাথে উপরের দিকে উঠাতে হবে। একই সাথে অপর পাটাকে দুশিয়ে উপরে ছান কাঁধের শাইলে নিয়ে বেড়ে রাবে, তার ফলে পিঁটো ক্লসবারের দিকে চলে আসবে।
৩. ক্লসবার অভিজ্ঞম করা (ক্লসবার ক্লিয়ারেল)- যেই মাত্র দেহ মাটি হেঢ়ে উপরে উঠবে, সাথে সাথে হাত দুটো পাশের দিকে দেহের সমাজরালে এনে যাবা, মধ্য শরীর ও কোমরের নিয়াল্পকে ক্লসবারের উপর দিয়ে অভিজ্ঞম করাতে হবে।
৪. মাটিতে নামা (শ্যাডিথ)- হাত ও পা দুটোকে উপরে ছুলে দিয়ে পিঁটের সাহায্যে ম্যাটের উপর পড়িয়ে বেড়ে হবে।



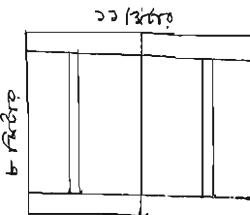
ফসবেরি ঝপ

কাজ-১ : ফসবেরি ফুপ কৌশলটির বিভিন্ন ধাপ প্রদর্শন করে দেখাও।

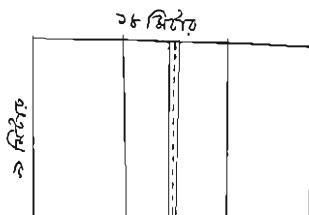
অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. কোন খেলাটি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সাফ গেমসে প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়?
 - ক. হকি খ. বাস্কেটবল গ. কাবাডি ঘ. টেনিস
 ২. 'রোটেশন' পদ্ধতিতে কোন খেলায় খেলোয়াড়গণ তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেন?
 - ক. ব্যাডমিন্টন খ. ভলিবল গ. হাত্তুড় ঘ. হকি
- নিচের চিত্র দুইটি লক্ষ্য করে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



চিত্র : X



চিত্র : Y

৩. 'X' চিত্রের সাথে কোন শব্দটি সম্পর্কিত?

- ক. রোটেশন খ. স্ম্যাশ
- গ. স্ট্রাগল ঘ. অফসাইড

৪. 'X' ও 'Y' চিত্রের খেলার সাথে কোন বাক্যটি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

- ক. 'X' দেশি খেলা ও 'Y' বিদেশি খেলা
- খ. 'X' বিদেশি খেলা ও 'Y' দেশি খেলা
- গ. 'X' খেলায় সার্ভিস জোন ও 'Y' খেলায় লবি থাকে কাবাডি
- ঘ. 'X' খেলায় রোটেশন ও 'Y' খেলায় লোনা হয়

৫. অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকে স্ট্যাগার্ড ব্যবহার করা হয় কেন?

- ক. দৌড়ের গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য
- খ. সময়ের ব্যবধান কমানোর জন্য
- গ. খেলোয়াড়দের দৌড়ের দূরত্ব সমান করার জন্য
- ঘ. সম্পূর্ণ দূরত্বে শক্তি বন্টনের সুবিধার জন্য

৬. দীর্ঘ লাফ প্রতিযোগিতায়-

- i. মাটি থেকে উপরে উঠার সময় টেক অফ বোর্ড ব্যবহার করা হয়
- ii. বাম পায়ের পাতাকে পিছনে নিয়ে ডান পায়ের গোড়ালির কাছে রাখা হয়
- iii. আগে থেকে নিজের পদক্ষেপ ঠিক করে নিতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মাদ্রাসার আন্তঃহাউজ ফুটবল খেলায় আক্রমন ভাগের খেলোয়ার ইমন রক্ষণভাগের খেলোয়াড় আরাফকে প্রচল ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। এতে আরাফের হাতে লেগে বল গোললাইন অতিক্রম করে। রেফারীর কাছে আক্রমন ভাগের খেলোয়াড়গণ গোলের আবেদন করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

৭. রেফারী গোলের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন কেন?

- ক. গোলের আগে ইমন অফসাইড করেছিল
 খ. গোলের আগে ইমন ফাউল করেছিল
 গ. আরাফের হাতের ছোঁয়ায় গোল হয়েছিল
 ঘ. ইমন পেনাল্টি এরিয়ার ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল

৮. পরবর্তীতে রেফারী কোন সিদ্ধান্ত দিয়েছিল?

- ক. ইমনকে ইনডাইরেন্ট ফ্রি কিক দিয়েছিল
 খ. আরাফকে ডাইরেন্ট ফ্রি কিক দিয়েছিল
 গ. ইমনকে কর্ণার কিক দিয়েছিল
 ঘ. আরাফকে ইনডাইরেন্ট ফ্রি কিক দিয়েছিল

৯. বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কতজন খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠন করা হয়?

- ক. ১০ খ. ১১
 গ. ১৪ ঘ. ১৫

১০. উচ্চ লাফ দেয়ার ল্যাভিং এরিয়ার দৈর্ঘ্য কত মিটার?

- ক. ২ খ. ৩
 গ. ৪ ঘ. ৫



শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন মানুষকে দায়িত্বশীল করে

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য